The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXII, pp 199-223, ISSN 2306-3920

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে ১৯৪৭ সালের দেশভাগ

সুমাইয়া শিফাত*
খন্দকার হাবীবুর রহমান**

[**সার-সংক্ষেপ :** ঐতিহাসিকভাবেই ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগ আপামর ভারতবাসীর জীবনে সূচিত করেছিলো বিশাল পরিবর্তন। কেবল ধর্মের ভিত্তিতে এই রাজনৈতিক বিভাজন দুই রাষ্ট্রের একটি বড় অংশে হিন্দু এবং মুসলিম জাতির বহু মানুষের জীবনে নিয়ে এসেছিলো ভয়াবহ যাতনা। দেশভাগের সাথে জড়িয়ে রয়েছে সাম্প্রদায়িকতার অসংখ্য নির্মম ও কুৎসিত ঘটনা। কেবল ধর্ম পরিচয় ভিন্ন হবার কারণে নির্যাতন, প্রাণহানি আর নিষ্ঠুর আচরণ ভোগ করতে হয়েছিলো অগণিত মানুষকে। ইতিহাসকে তুলে ধরার লক্ষ্যে শিল্পের অন্যান্য মাধ্যমের ন্যায় চলচ্চিত্রেও দেশভাগকালীন চিরতরে দেশ ত্যাগের বেদনা কিংবা ব্যক্তির মানসিক-আত্মিক দ্বন্দ্বের মতো বিষয়গুলোকে রূপায়ণ করা হয়েছে। তাই বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে দেশভাগের চিত্রায়ন অনুসন্ধানে আলোচ্য গবেষণাটি তিনটি প্রশ্নকে সামনে রেখে পরিচালিত হয়েছে- বাংলাদেশে দেশভাগ নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্রে দেশভাগকে কীভাবে তুলে ধরা হয়েছে; কাহিনী, প্রেক্ষিত এবং আঙ্গিক বিচারে এই চিত্রায়নের ধরন কীরূপ এবং তৎকালীন প্রেক্ষাপটে বাঙ্গালির জীবন-যাপনে কী ধরনের প্রভাব ফেলেছিলো। আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে দু'টি চলচ্চিত্রকে নমুনা হিসেবে নিয়ে এ গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে, '৪৭ এর সংকটময় পরিস্থিতি ধর্মীয় পরিচয়কে সামনে এনে বাঙালি সত্তাকে চরম দ্বন্দ্বের মুখে ফেলে দিয়েছিলো। নানাবিধ সংকট তৈরির মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক বাঙালির জীবন ও মননে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিলো, বপন করেছিলো সাম্প্রদায়িকতার বীজ।]

মূলশব্দসমূহ: চলচ্চিত্র, দেশভাগ, বাঙালি, সংকট, সাম্প্রদায়িকতা।

ভূমিকা:

প্রায় ২০০ বছর ধরে চলা ব্রিটিশ শাসনামলের শেষ দিকে প্রবল রাজনৈতিক মতভেদ আর হিন্দু-মুসলিম ধর্মীয় দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষের বেড়াজালে বিদ্ধ হয় ভারতীয় উপমহাদেশ। দীর্ঘদিন ধরে চলা দ্বন্দ্বের ইতি টানতে ১৯৪৭ সালে দেশভাগ হয়। ধর্মের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয় দু'টি রাষ্ট্র- ভারত এবং পাকিস্তান। দেশভাগের পাল্লায় ধর্মের ভিত্তিতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে বর্তমানের বাংলাদেশকে পূর্ব পাকিস্তান নামে ফেলা হয় পাকিস্তানে। এভাবে তৎকালীন পূর্ব বাংলা হলো পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম বাংলা পড়লো ভারতে। এই সিদ্ধান্তে পূর্ব বাংলায় বসবাসরত বিপুলসংখ্যক বাঙালি পড়লো অসীম সংকটে। দীর্ঘদিনের বসতভিটা

---

* **সুমাইয়া শিফাত :** সহকারী অধ্যাপক, জার্নালিজম এন্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

** **খন্দকার হাবীবুর রহমান :** যুগ্ম বার্তা সম্পাদক, বৈশাখী টেলিভিশন, মহাখালী, ঢাকা।

ছেড়ে, নাড়ীর টান ছিঁড়ে ধর্মের কারণে কেউ চলে গেলেন ভারতে, কেউবা পাকিস্তানে। রাজনীতির কূটকৌশলে একই নদীর পানি আর একই ক্ষেতের ফসল খাওয়া মানুষগুলো হয়ে উঠলো চিরকালীন শত্রু। এ পালাবদলে প্রাণ হারালেন, নিঃস্ব হলেন নানা বয়সী, বহু নিরপরাধ মানুষ। কেবল ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হলেও অবিশ্বাস, অনৈক্য ও আস্থার সংকট শুরু থেকেই এ দ্বন্দ্বকে আরো ঘনীভূত করেছে।

'দেশ বিভাগ' সরকারি ইতিহাসে আলোচিত হয়েছে সাংবিধানিক ইতিহাসের পরিভাষায়, নতুন সৃষ্ট দুই রাষ্ট্রের মধ্যকার বিতর্ক; নেহরু, গান্ধী ও জিন্নাহর মধ্যকার সমঝোতা ও বিরোধিতা; কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান বিভাজন প্রভৃতিতে। অথচ সীমান্তের দুই পাড়ের বাসিন্দা সাধারণ মানুষের জীবনের বিপর্যয় ও অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরার কোনো চেষ্টাই নেওয়া হয়নি। ভারতের বিভক্তিকরণ শুধু একটি সাংবিধানিক দেশবিভক্তিতেই নিষ্পত্তি হয়নি, বরং বহু ক্ষেত্রেই তা ছিল অসংখ্য ঘরগেরস্তালি, পরিবার ও মানুষের জীবনের মর্মান্তিক ব্যবচ্ছেদ (আহমেদ, ২০২১)।

দেশভাগের ক্ষত এবং সাম্প্রদায়িকতার কুৎসিত রূপ প্রবন্ধে কামরুল হাসান বাদল (২০২১) বলেন, ভারত ভাগে সবচেয়ে বেশি মূল্য দিতে হয়েছে বাংলা ও পাঞ্জাবকে। কেননা এই দু'টি প্রদেশও ভাগ হয়ে পড়েছিলো দুই দেশে। তাই ভিটেমাটি ছেড়ে এপার থেকে ওপারে, ওপার থেকে এপারে পাড়ি জমাতে হয়েছে লাখ লাখ মানুষকে। এক কোটিরও বেশি মানুষ বাস্তুহারা হয়ে পড়েছিল। অনেকেই হয়ে পড়েছিলো ঠিকানাহীন। লাখ লাখ মানুষের জীবনযাত্রা পাল্টে গিয়েছিলো। রাতারাতি রাজা থেকে ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছিলেন অনেকেই। সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল মানবতা। সে লাঞ্ছনা, অত্যাচার আর ভয়াবহ নির্যাতনের ক্ষত এখনো শুকায়নি বাংলা ও পাঞ্জাবের মানুষের মন থেকে। সেই বর্বরতা এই দুই জনপদে চিরস্থায়ী ক্ষত রেখে গেছে (বাদল, ২০২১)।

দেশভাগের উপর নির্মিত *সীমান্তরেখা (২০১৭)* প্রামাণ্যচিত্রে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র পরিচালক তানভীর মোকাম্মেল উল্লেখ করেছেন, ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের কারণে বাংলা ভাগ হলো। বাংলা ভাগের ফলে ভারত থেকে প্রায় ২০ লক্ষ মুসলমান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আসেন এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় ৫৮ লক্ষ মানুষ ভারতে দেশান্তরী হন (মোকাম্মেল, ২০১৭)। প্রকৃতপক্ষে, বঙ্গবিভাজনের অন্যতম ট্র্যাজিক পরিণতি হলো দুই বাংলাজুড়ে লাখ লাখ মানুষের এই আকস্মিক বিচ্ছেদ। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ না থাক, এই দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে আগে থেকেই ছোঁয়াছুঁয়ির সতর্কতা ছিলো তীব্র। একই কথা এসেছে সুনন্দা শিকদারের ভাষায়, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও বঙ্গবিভাজনের মূলে আছে ওই ছোঁয়াছুঁয়ির সমস্যা। হিন্দুদের শরীর মুসলমান স্পর্শ করলে হিন্দুদের জাত যায়। এর অর্থ হিন্দু-মুসলমান দু'টি আলাদা জাতি। তখনই এসে যায় জাতিবিরোধ। এই বিরোধে হিন্দুরাই ঐ সময়টাতে হয়ে পড়েছিল দুর্বল প্রতিপক্ষ। সে কারণেই দলে দলে দেশত্যাগ করেছে হিন্দুরা (মুন্না, ২০১৯)।

বাংলা সাহিত্যে দেশভাগ নিয়ে লেখায় দেবদুলাল মুন্না বলেন, বাংলাদেশে দেশভাগ নিয়ে প্রথম দিকের উপন্যাসে দেশভাগের ফলে উদ্বাস্তু সমস্যা, বাস্তুচ্যুতির জন্য বেদনাবোধ, স্মৃতিকাতরতা ও ভয়ার্ত অস্তিত্ব-সংগ্রামের ইতিবৃত্ত লেখকদের উদারনৈতিক মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করতে দেখা গেছে। কখনো ডকুমেন্টারির মত করেও দেশভাগের ঘটনার উপস্থাপন করা হয়েছে। তারপর কালে কালে তার বিস্মৃতি ঘটেছে। কিন্তু পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের মত বিষয়ের প্রাধান্যের কারণে বিষয়বস্তু হিসেবে দেশভাগ আর সেভাবে আসেনি (মুন্না, ২০১৯)।

দেশভাগের কারণে ছিটকে পড়াদের মর্মস্পর্শী বয়ান সম্বলিত বিয়োগান্তক ইতিহাসকে নাটক-উপন্যাস-চলচ্চিত্রে নানা উপায়ে রূপায়িত করেছেন সাহিত্যিক-নির্মাতারা। ইতিহাসকে লিপিবদ্ধ করার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রে একইসাথে ইতিহাসের নানা স্তর যেমন থাকতে পারে, তেমনি মানব মনের সূক্ষ্ম চেতনা, বোধও এর পরতে পরতে ছড়িয়ে থাকে। তবে ইতিহাসের মতো সাহিত্য,

চলচ্চিত্রের ধারাতে স্বাধীনতা সংগ্রামের জয়গান এলেও দেশভাগের বেদনা তাতে বিরল (পান্ডে, ১৯৯৮: ২৬৩)। তাই পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের মত দেশভাগকে উপজীব্য করে চলচ্চিত্র নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছেন বাংলাদেশের কিছু নির্মাতাও। তারা দেশভাগের প্রভাবে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনকে বড়পর্দায় নান্দনিক নির্মাণশৈলী ও কাহিনীর বুননে তুলে এনেছেন।

এক্ষেত্রে নানা আঙ্গিক এবং ছন্দে নির্মাতারা '৪৭ এর দেশত্যাগের এ মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতার চিত্রায়ন ঘটিয়েছেন বড় পর্দায়। যদিও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, দেশভাগের মত ঐতিহাসিক বিষয়টি চলচ্চিত্র নির্মাতাদের দৃষ্টিতে খুব সামান্যই গুরুত্ব পেয়েছে। বরং সমসাময়িক, রোমান্টিক এবং সামাজিক বিষয়গুলো ঘুরেফিরে প্রাধান্য পেয়েছে। এজন্য স্বল্পসংখ্যক হলেও নির্মাতারা দেশভাগকে বড়পর্দায় কীভাবে উপস্থাপন করেছেন তা লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন।

আলোচ্য গবেষণাটিতে স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৪৭ সালের দেশভাগ নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্রে দেশভাগের ন্যায় ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়কে আধেয়, প্রেক্ষিত এবং আঙ্গিক বিচারে কীভাবে তুলে ধরা হয়েছে এবং তৎকালীন প্রেক্ষিতে দেশভাগ বাঙ্গালির জীবন এবং যাপনে কী ধরনের প্রভাব ফেলেছিলো তা অনুসন্ধানের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য:

ইতিহাসে একক বা বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয় বরং দেশভাগ- এর ফলাফল ছিলো সুদূরপ্রসারী। এর কারণে যে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ঘটেছে ভুক্তভোগীদের জন্যে তা আজও সমানভাবে বেদনাদায়ক। দাঙ্গায় এবং দেশভাগের কারণে সে সময় অগণিত মানুষ প্রাণ হারায়, দেশত্যাগ করে; বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়। বাস্তুচ্যুতি ও প্রাণহানির সাথে তৎকালীন যে মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয় ঘটেছিল তার বড়পর্দায় রূপায়ণ অনেকটা ইতিহাসের দলিল। এজন্য এই বিষয়টিকে শিল্প-সাহিত্যের অন্যান্য মাধ্যমের মত চলচ্চিত্রের পর্দায় কীভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে ও দেশভাগের নানা প্রেক্ষিতকে কীভাবে তুলে ধরা হচ্ছে তা অনুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে। মূলত চলচ্চিত্রে দেশভাগের মত ঐতিহাসিক বিষয়টিকে বাংলাদেশের নির্মাতারা কীভাবে তুলে ধরেছেন তা অনুসন্ধানের নিমিত্তে এই গবেষণাটি সহায়ক হবে।

গবেষণাটির উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে -

- বাংলাদেশে দেশভাগ নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্রে এ বিষয়টিকে কীভাবে তুলে ধরা হয়েছে তা অনুসন্ধান।
- প্রেক্ষিত, কাহিনী এবং আঙ্গিক বিচারে এই চিত্রায়নের ধরন নিরূপণ।
- তৎকালীন প্রেক্ষাপটে দেশভাগ বাঙ্গালির জীবন এবং যাপনে কী ধরনের প্রভাব ফেলেছিলো তা খুঁজে দেখা।

গবেষণার যৌক্তিকতা:

দেশভাগকে প্রেক্ষাপট হিসেবে নিয়ে বাংলাদেশে স্বল্পসংখ্যক পরিচালক চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ভারতীয় চলচ্চিত্রে যেভাবে এসেছে আমাদের দেশীয় চলচ্চিত্রে তা সেভাবে মূখ্য হয়ে ওঠেনি। দেশভাগের কারণে ভুক্তভোগী বিভিন্ন ব্যক্তির লেখায় এ সংক্রান্ত নানা বক্তব্য বা গল্প-উপন্যাসে বিষয়টি উঠে এসেছে। দেশভাগের মত বৃহত্তর বিষয়টি চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে কীভাবে আসছে বা তার নানা প্রেক্ষিত নিয়ে গবেষণামূলক লেখা সীমিত। এজন্য বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে ১৯৪৭ সালের দেশভাগ- গবেষণার মধ্য দিয়ে, বাংলাদেশে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলো কীভাবে দেশভাগের বিষয়টি নানা আধেয় ও প্রেক্ষিতের মাধ্যমে উপস্থাপন করে তা লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

গবেষণা প্রশ্ন:

গবেষণাটি নিম্নের প্রশ্নগুলোকে সামনে রেখে সম্পাদিত হয়েছে -

১. বাংলাদেশে দেশভাগ নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্রে দেশভাগকে কীভাবে তুলে ধরা হয়েছে ?

২. কাহিনী, প্রেক্ষিত এবং আঙ্গিক বিচারে এই চিত্রায়নের ধরন কীরূপ ? এবং তৎকালীন প্রেক্ষাপটে দেশভাগ বাঙ্গালির জীবন এবং যাপনে কী ধরনের প্রভাব ফেলেছিলো ?

প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা:

প্রাসঙ্গিক হিসেবে সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় এবং গবেষণামূলক প্রবন্ধে দেশভাগ প্রাধান্য পেয়েছে। আলোচনার এই অংশে এ ধরনের কিছু প্রবন্ধ এবং লেখাকে প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনার জন্য বাছাই করা হয়েছে।

ইতিহাসে শ্রেণীবিভেদ এবং হিন্দু-মুসলিম জাতির মধ্যকার বিবাদ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ১৩৩৯ সালে প্রবাসী পত্রে 'সমস্যা' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। যেখানে তিনি ভারতবর্ষের মঙ্গলে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের পাশাপাশি উভয়পক্ষের সামাজিক সমকক্ষতার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তাঁর মতে,

> প্রধান সমস্যা হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। তার সমাধান এত দু:সাধ্য, কারণ দুই পক্ষই মূলত আপন আপন ধর্মের দ্বারাই অচলভাবে আপনাদের সীমা নির্দেশ করেছে। সেই ধর্মই আমাদের মানব বিশ্বাসকে সাদাকালো ছক কেটে সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত করেছে- আত্ম ও পর। সংসারে সর্বত্রই আত্মপরের মধ্যে কিছু পরিমাণ স্বাভাবিক ভেদ আছে। সেই ভেদের পরিমাণটা অতিমাত্রায় হলেই তাতে অকল্যাণ হয়। (দত্ত, ২০১৯)

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের আলোকে বলা যায়, জমিদারি প্রথার কারণে ধনী জমিদারশ্রেণীর হাতে এ অঞ্চলের নিম্নবর্গের মুসলিমরা প্রচণ্ড শোষিত ও নিপীড়িত ছিলো। ক্রমশ সামন্ততান্ত্রিক এই অবস্থা থেকে মুক্তির নিমিত্তে স্বাধীন দেশের স্বপ্ন তাদের মনে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তির আশা দিয়েছিলো। এ কারণেই জিন্নার পাকিস্তান এর স্বপ্নে এই পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠী আশান্বিত হয়। কিন্তু এই পাকিস্তান গঠনের পেছনের রাজনীতি এবং ভবিষ্যতের কথা তাদের জানা ছিলো না। তাই ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হলে আপামর বাঙালির সত্তা চরম সংকটে পড়ে যায়। এসময় দাঙ্গায় প্রাণভয়ে হুট করে দেশত্যাগের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের বহু অবস্থাসম্পন্ন পরিবার ভয়াবহ দুর্দশায় পড়ে যায়। হিন্দুদের জন্য ভারত আর মুসলিমদের জন্য পাকিস্তান- এমন ধারণা ও সিদ্ধান্ত কয়েক কোটি মানুষকে বাস্তুচ্যুত করেছিলো। দাঙ্গা ও হানাহানিতে নিহত হতে হয়েছিলো হাজার হাজার মানুষকে। অগণিত নারীকে নির্যাতিত হতে হয়েছিলো প্রতিপক্ষের হাতে।

রাজনৈতিক সমাধান হিসেবে দু'টি ভিন্ন সম্প্রদায়কে লাইন টেনে পৃথক করার কাজটি করেন সিরিল র‍্যাডক্লিফ। কিন্তু শিগগিরই ১ কোটি ২০ লাখ মানুষকে এই বিভক্তি লাইন পেরোতে হয় বসবাসের জন্যে। এর পরের ধর্মীয় সহিংসতায় প্রাণ হারায় প্রায় ৫-১০ লাখ মানুষ। দেশভাগ নিয়ে তানভীর মোকাম্মেলের *সীমান্তরেখা* (২০১৭) প্রামাণ্যচিত্রে এক সাক্ষাৎকারে ঔপন্যাসিক দেবেশ রায় বলেন,

> এটা তো ঐতিহাসিক সত্য যে বাঙালি হিন্দু কংগ্রেসী নেতারা এবং হিন্দু মহাসভার নেতারা পশ্চিমবঙ্গের একটা অংশ টুকরো করে নিতে চাইছিলেন যে টুকরোটাতে হিন্দুদের নিরাপত্তা থাকবে। যদি বলেন, দেশভাগ করে লাভ হলো কার? তাহলে আমি নিশ্চিতভাবে বলবো বাঙালি মুসলমান সমাজের। সুতরাং বাঙালির জীবনে একটা প্রশ্ন অমিমাংসিত থাকলো, সে অমিমাংসাটি হচ্ছে হিন্দু-মুসলিম এই যে দু'টি ধর্মীয় সমাজ নিয়ে এতো বছর

> ধরে আছে, তার নিজস্ব গতিবেগ নিয়ে, তার নিজস্ব উত্তেজনা নিয়ে, উদ্বেগ নিয়ে, তার কোন সামাজিক, সাংস্কৃতিক নিরসন হলো না, হলো একটা রাজনৈতিক নিরসন। (মোকাম্মেল, ২০১৭)

খুশবন্ত সিং এর *ট্রেন টু পাকিস্তান (১৯৯৬)* উপন্যাসে '৪৭ এর দেশভাগের চিত্র, বর্ণিত চরিত্রগুলোর মানসপটে ফুটে উঠেছে। ১৯৪৭ সালের গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত অর্থাৎ নতুন রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার আগ পর্যন্ত এক (০১) কোটি লোক- হিন্দু, মুসলমান, শিখ পালিয়ে বেড়ালো। প্রায় দশ লাখ মানুষ নিহত হলো। ভীতির শিকার হলো ১ কোটি লোক, তারা পালিয়ে রইলো। খুশবন্ত আরো লেখেন, '৪৭ এর গ্রীষ্মের আগে দ্রুত খবর রটে যে, দেশটা ভারত ও পাকিস্তানে ভাগাভাগি হচ্ছে। শুরু হয় দাঙ্গা; প্রথমে কলকাতায় তারপর পূর্ব বাংলা এবং এরপর বিহারে। হত্যাযজ্ঞে প্রাণ হারালো বহু মানুষ, তারা কেউ হিন্দু, মুসলিম বা শিখ (সিং, ১৯৯৬: ০২)।

পান্ডের মতে, বিরোধের ইতিহাস বলতে গিয়ে পুরনো ক্ষত খুঁচিয়ে তোলার বিপদটা অবহেলার নয়। আবার দেশভাগের চরিত্র নিয়েও আমাদের মধ্যে মতৈক্য নেই। একে কীভাবে উপস্থাপিত করবো, কী করে এর দায়িত্ব নেবো, তা আমরা জানি না। এ কারণেই জাতীয়তাবাদী ইতিহাসে, সাংবাদিকতায় অথবা চলচ্চিত্রে দেশভাগ নিয়ে একটা সামগ্রিক বিস্মৃতি তৈরি হয়েছে। সেখানে সচেতনে বা অবচেতনে এটা একটা ব্যতিক্রম ঘটনা হিসেবেই রূপায়িত হয়েছে (পান্ডে, ১৯৯৮: ২৬৪)। এই মর্মান্তিক ঘটনা দুই পারের অগণিত মানুষের জীবন, সম্পর্ককে যেন সূক্ষ্ম কাঁটাতারের বেড়ায় আলাদা করে দিয়েছে। তারপরও, কোথাও দেশভাগের ইতিহাস লেখা হয়েছে শুধুই সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাস হিসেবে (পান্ডে, ১৯৯৮: ২৬১)। এ প্রসঙ্গে তানভীর মোকাম্মেল তাঁর *সীমান্তরেখা (২০১৭)* প্রামাণ্যচিত্রে বলেছেন, ইতিহাসে বাংলা আগেও বিভক্ত থেকেছে- রাঢ়, বরেন্দ্র, সমতট, হরিকেল। কিন্তু ১৯৪৭ সালের বিভাজনের মতো তা কখনোই এতটা নিয়ামক ও সুদূরপ্রসারী ছিলো না। বাংলার দুই অংশের মাঝে কখনো টানা হয়নি কাঁটাতারের বেড়া (মোকাম্মেল, ২০১৭)।

আবার ধর্মের ভিত্তিতে দেশের এই বিভক্তিকরণ বাঙালিকে আত্মপরিচয়ের সংকটে ফেলে দেয়। নিজের মাতৃভাষা, সংস্কৃতিকে যেন দেয়ালের ওপারে ভাবতে বাধ্য হয়। দেশভাগে জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ হিসেবে নারী বর্বরভাবে নির্যাতিত হয়েছেন। এদের মধ্যে অনেক নারী সর্বস্ব হারিয়ে আজীবন উদ্বাস্তু হিসেবে কোনোমতে জীবন কাটিয়েছেন, এমনকি আর পরিবারেও ফিরতে পারেননি। নারীর এ হাহাকার যেন সেভাবে কোথাও উঠে আসেনি। যদিও পরবর্তীকালে কিছু লেখক, সাহিত্যিক, গবেষক দেশভাগে নারীর ভুক্তভোগী হবার এ মর্মস্পর্শী বেদনাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বীণা দাস (১৯৯৮) *হিংসা, দেশান্তর ও ব্যক্তিগত কণ্ঠস্বর* প্রবন্ধে, ১৯৪৭ এর দেশভাগে ও দাঙ্গায় উদ্বাস্তু নারীদের কথা উল্লেখ করেছেন। যেখানে তিনি নারীদের বয়ানে এই ট্র্যাজেডির এক অপূরণীয় ট্রমার কথা বলেন। ভূক্তভোগী নারীরা তাদের পুরুষ পরিচিতজন দ্বারাই হয় নির্যাতনের শিকার হয়েছেন অথবা অসতী সন্দেহের অনলে আজীবন পুড়েছেন। তাঁর মতে, দেশান্তরের অভিজ্ঞতার ভয়াবহতা বোধ হয় সবচেয়ে বেশি আঘাত করে তাদেরই, পরিবারের ভেতর যাদের নিরাপত্তা কিছুটা কম। তাই স্বাভাবিকভাবেই পুরুষদের তুলনায় নারীর ওপর এসব ঘটনার প্রতিক্রিয়া ভিন্ন (দাস, ১৯৯৮: ১৮৭-৮৮)।

চলচ্চিত্রের মত আঙ্গিকের ক্ষেত্রে দেশভাগে সবকিছু হারানো মানুষদের বেদনা, জীবনবোধ এবং স্বপ্ন নিয়ে একমাত্র সরব ছিলেন বাঙালি নির্মাতা ঋত্বিক ঘটক। দেশভাগের কারণে পৈতৃক ভূমি পূর্ব বাংলা ছেড়ে ঋত্বিককে চলে যেতে হয়েছিলো ওপারে। যেখানে আজীবন তিনি নিজ জন্মভূমি নিয়ে অনুভবের অনলে পুড়েছেন, হাহাকার করেছেন। পরবর্তীতে চলচ্চিত্রের পর্দাকে ব্যবহার করেছেন তাঁর এই বেদনা, কষ্টকাব্যকে তুলে ধরার মাধ্যমরূপে। *কোমল গান্ধার (১৯৫৯), মেঘে ঢাকা তারা*

(১৯৬০), সুবর্ণরেখা (১৯৬২)- ঋত্বিকের এই ট্রিলজি যেন দেশভাগে সর্বস্বান্ত মানুষের বেদনার জীবন্ত বয়ান। দারিদ্র্য, ভিটেমাটি হারানোর বেদনা, জীবনে না পাবার যন্ত্রণা, স্বপ্নের নির্মম পরিসমাপ্তি, হাহাকার, প্রতিনিয়ত অবহেলা, আর কাঁটাতারের বেড়ায় জীবনের বন্দিত্ব- এমনই সব ছবি চলচ্চিত্রের পর্দায় এঁকে গিয়েছেন তিনি। তাঁর এই বার্তাগুলো যেন আজও দেশভাগের দুঃসহ পরিণতিকে আমাদের সামনে তুলে ধরে, মননে আঘাত করে, ভাবায়।

সুতরাং এ গবেষণাধর্মী লেখায় বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে দেশভাগের বিবিধ প্রেক্ষিতকে কীভাবে তুলে ধরা হচ্ছে তা নিরূপণ করা হয়েছে।

তাত্ত্বিক কাঠামোঃ

এই গবেষণায় তাত্ত্বিক কাঠামো হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে স্টুয়ার্ট হলের রেপ্রিজেন্টেশন তত্ত্ব। রেপ্রিজেন্টেশন হলো ভাষার মাধ্যমে অর্থ উৎপাদন। ভাষার মধ্যেই বিভিন্ন রেপ্রিজেন্টেশন-পদ্ধতির মধ্যে বা মাধ্যমে অর্থ তৈরি হয়। আর এই রেপ্রিজেন্টেশন-পদ্ধতিগুলোকে আমরা ভাষা বলি। অর্থ তৈরি হয়ে থাকে চর্চার মাধ্যমে এবং রেপ্রিজেন্টেশনের 'কারবার'- এর মধ্য দিয়ে। এটা নির্মিত হয় দ্যোতনায়ন বা অর্থোৎপাদন চর্চার মধ্য দিয়ে (হল, ২০০৭[২০১৫]: ৩৮)।

জ্যামাইকান তাত্ত্বিক হলের এই তত্ত্বটি অর্থ ও ভাষাকে সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত করে। হলের রেপ্রিজেন্টেশন তত্ত্ব অনুযায়ী, ব্যক্তি অর্থপূর্ণভাবে চারপাশের জগৎকে অন্যদের কাছে উপস্থাপন করতে ভাষাকে ব্যবহার করে। এটি এমন একটি প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অংশ যার দ্বারা একটি সংস্কৃতিতে সদস্যদের মধ্যে অর্থ বিনিময়, উৎপাদন এবং নির্মিত হয়ে থাকে। সুতরাং, এই তত্ত্বে রেপ্রিজেন্টেশন বলতে বোঝানো হয়েছে, ব্যবহৃত ভাষার মাধ্যমে মানুষের মনে বিরাজিত ধারণাগুলোর অর্থ উৎপাদন।

পরবর্তীতে সুইশ ভাষাতাত্ত্বিক ফার্দিনান্দ ডি সস্যুর হলের এ তত্ত্বকে আরো গভীরভাবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে, অর্থের উৎপাদন ভাষার ওপর নির্ভর করে। ভাষা হলো চিহ্ন পদ্ধতি। ধ্বনি চিত্র, লিখিত শব্দ, চিত্রকলা, আলোকচিত্র ইত্যাদি ভাষার মধ্যে চিহ্ন হিসেবে কাজ করে তখনই যখন ধারণা প্রকাশ করতে বা যোগাযোগ করতে তারা কাজ করে (হল, ২০০৭[২০১৫]: ২১)।

আবার সস্যুর- এর মতে, চিহ্নের উপাদান দু'টি। যেটি হল রূপ এবং এর সঙ্গে যুক্ত ভাবনা। প্রথমটিকে তিনি বলেছেন দ্যোতক (Signifier) এবং পরেরটিকে বলেছেন দ্যোতিত (Signified)। অর্থের উৎপাদন ভাষার ওপরে নির্ভর করে। এই ভাষা হলো চিহ্ন পদ্ধতি। ধারণা প্রকাশ করতে বা যোগাযোগ করতে ধ্বনি, চিত্র, লিখিত শব্দ, চিত্রকলা, আলোকচিত্র, ইত্যাদি ভাষার মধ্যে চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর এই যোগাযোগ করতে গিয়ে এইসব চিত্র বা শব্দকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রথার অংশ হতে হয়। বস্তু পদার্থও চিহ্ন হিসেবে কাজ করতে পারে (হল, ২০০৭: ৪১)।

ভাষা কীভাবে রেপ্রিজেন্টেশন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয় সে সংক্রান্ত তিনটি তত্ত্ব রয়েছে। এগুলো হচ্ছে- ভাষা বিদ্যমান জগৎকে তুলে ধরে (প্রতিফলনকারী); বক্তা তার বক্তব্যের মাধ্যমে যা বোঝাতে চান সেটি তুলে ধরে (স্বেচ্ছাকৃত) এবং ভাষার মধ্যে ও ভাষার মাধ্যমে অর্থ নির্মাণ করা হয়ে থাকে (নির্মাণবাদী) (হল, ২০০৭[২০১৫]: ২৩)। আলোচ্য গবেষণায় রেপ্রিজেন্টেশনের নির্মাণবাদী ধারার আলোকে নমুনাকৃত চলচ্চিত্রে দেশবিভাগকে কীভাবে বিভিন্ন বিষয়ের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করা হয়েছে সেটি অনুসন্ধান করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতিঃ

আলোচ্য গবেষণাটি সম্পন্ন করার জন্য আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এরপর প্রাপ্ত তথ্য গুণবাচক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আধেয় বিশ্লেষণ বা কন্টেন্ট অ্যানালাইসিস এমন

একটি গবেষণা পদ্ধতি যা টেক্সট বা একগুচ্ছ টেক্সটে কিছুসংখ্যক শব্দ বা ধারণার অন্তর্ভুক্তি নিয়ে আলোচনা করে (আমিনুজ্জামান, ২০১১: ৬৫)।

বাংলাদেশে সীমিতসংখ্যক চলচ্চিত্রে দেশভাগ বিষয়টি পরোক্ষভাবে এলেও মূল উপজীব্য হিসেবে তা স্বল্পসংখ্যক চলচ্চিত্রে এসেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আবু ইসহাকের উপন্যাস অবলম্বনে মসিহউদ্দীন শাকের ও শেখ নিয়ামত আলীর *সূর্য দীঘল বাড়ী (১৯৭৯)*। *সূর্য দীঘল বাড়ী*, যেখানে পঞ্চাশের মন্বন্তরে দুর্ভিক্ষে জর্জরিত নিম্নশ্রেণীর মানুষের কঠিন জীবনসংগ্রামের চিত্র উঠে এসেছে। যাদের আশা ছিল স্বাধীন দেশ পাকিস্তান হলে তাদের অভাব দূর হবে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হলেও সে আশা পূরণ হয় না। এই গবেষণায় বাংলাদেশে নির্মিত দেশভাগ নিয়ে চলচ্চিত্রগুলো থেকে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতিতে তানভীর মোকাম্মেল পরিচালিত *চিত্রা নদীর পারে* (১৯৯৯) এবং আকরাম খানের *খাঁচা* (২০১৭)- এই দু'টি চলচ্চিত্র বাছাই করা হয়েছে। *চিত্রা নদীর পারে*, ১৯৯৯ সালে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র, পরিচালকসহ সাতটি বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার জিতেছে। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্প *খাঁচা* অবলম্বনে আকরাম খানের খাঁচা চলচ্চিত্রটি সেরা চলচ্চিত্রসহ মেরিল-প্রথম আলো ২০১৭ এর তিনটি পুরস্কার জিতেছে।

নমুনায়নকৃত চলচ্চিত্রগুলোর আধেয় বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন চরিত্রের উপস্থাপনের মাধ্যমে কীভাবে বাঙালির এই বেদনালব্ধ হাহাকারের ইতিহাসকে তুলে ধরা হয়েছে এবং তৎকালীন প্রেক্ষাপটে এই দেশভাগ বাঙ্গালির জীবন এবং যাপনে কী ধরনের প্রভাব ফেলেছিল তা খুঁজে দেখার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

চিত্র-১: *চিত্রা নদীর পারে (১৯৯৯)* চলচ্চিত্রের একটি পোস্টার

***চিত্রা নদীর পারে* (১৯৯৯)**

কাহিনী সংক্ষেপ: শশীকান্ত পেশায় উকিল। চিত্রার পাড়ে নড়াইলে কয়েক পুরুষ ধরে বাস তাদের। মা হারা দুই সন্তান-মিনতি, বিদ্যুৎ আর স্বামীহারা এক বোন নিয়ে তার সংসার। সারাদিন আদালত পাড়ায় ব্যস্ত সময় পার করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরেন শশী। সাতপুরুষের ভিটে তাদের, তাই '৪৭ এ দেশভাগ হলে সবাই যখন কলকাতায় পাড়ি জমাতে চাইছে তখনো শশীকান্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নিজ বাড়িতেই থাকবেন। ওদিকে মিনতিও বাবার মতোই এই বাংলায় থাকতে চায়, কিন্তু ভাই বিদ্যুৎ প্রতিবেশী মুসলমান কর্তৃক অপমানিত হয়ে দেশত্যাগে পণ করে। শশী তাকে ভাই বিরেনের কাছে কলকাতায় পাঠিয়ে দেন। শশীর ভাই নিধু পেশায় ডাক্তার। বিনা পয়সায় গ্রামের গরীবশ্রেণীকে চিকিৎসা দিয়ে বেড়ান। স্ত্রী আর বিধবা মেয়ে বাসন্তিকে নিয়ে তার সংসার।

চলচ্চিত্রের কাহিনী '৪৭ সাল থেকে শুরু হয়ে সময় গড়িয়ে ৬০ এর দশকে আসে। যেখানে ছোটবেলার খেলার সাথী বাদলের সাথে মিনতির সখ্যতা প্রেমে রূপ নেয়। একসময় বাদল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গ্রাম ছেড়ে শহরে যায়। সেখানে স্বাধিকার আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে, মিছিলে গুলি খেয়ে প্রাণ হারায়। দূর্গাপূজার ছুটিতে কলকাতা যায় মিনতি, ফিরে আসে বাদলের জন্যে কেনা বই 'দৃষ্টিপাত' নিয়ে। এসে জানতে পারে বাদলের মৃত্যুর কথা। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন বেগবান হতে থাকে, শুরু হয় দাঙ্গা। হিন্দু-মুসলিম এই দাঙ্গা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। দূর্গাপূজায় পূজা সেরে বাড়ি ফেরার পথে ধর্ষণের শিকার হয় বাসন্তি। লজ্জায়, অপমানে চিত্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণত্যাগ করে। মেয়ে হারিয়ে শোকাতুর নিধু স্ত্রীসহ কলকাতায় চলে যায়। আশেপাশের সবাই এভাবে যখন একে একে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছিলো তখনো জন্মভূমি পরিত্যাগের কথা ভাবতে পারেননি শশীকান্ত। কিন্তু নিরাপত্তার ভয় তাকেও পেয়ে বসছিলো। তাই এ দোদুল্যমানতা ও দুশ্চিন্তায় একসময় শশীও প্রাণত্যাগ করেন চিত্রার পাড়ে। শেষে সব হারিয়ে মিনতিও বাধ্য হয় ভিটেমাটি ছেড়ে কলকাতায় চলে যেতে।

চিত্র-২: *খাঁচা (২০১৭)* চলচ্চিত্রের একটি পোস্টার

খাঁচা (২০১৭)

কাহিনী সংক্ষেপ: গ্রামের হোমিওপ্যাথি ডাক্তার হিরণ। স্ত্রী সরোজিনী, চার সন্তান এবং বৃদ্ধ পিতাকে নিয়ে তার সংসার। একসময় যথেষ্ট সম্পদশালী এবং সম্মানীয় হলেও পরিবারটি দেশভাগের পর অর্থসংকটে ক্রমেই জৌলুস হারাতে থাকে। '৪৭ এর দেশভাগের পর হিরণ চেষ্টা করে কীভাবে বাড়ি বিনিময়ের মাধ্যমে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে যাওয়া যায়। তাই প্রতিনিয়ত স্ত্রী সরোজিনীর সাথে দেশত্যাগ নিয়ে নানা স্বপ্নের জাল বুনতে থাকে। হিরণের বাবা পণ্ডিত মশাইও ছেলের কাছে এ নিয়ে খোঁজ নেন। আর হিরণ-সরোজিনীর ছোট দুই সন্তান ভ্যাবলা, পুষ্প স্বপ্ন বোনে ওপারে তারা কোন স্কুলে ভর্তি হবে, সেই স্কুল আর সেখানকার বন্ধুরা কেমন হবে তাই নিয়ে। কিন্তু বারবারই ব্যর্থ মনোরথে ফিরতে হয় হিরণকে।

দেশভাগ হওয়ায় এপারে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাড়ে, দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মাঝে দ্বন্দ্ব বেড়ে যায়। তাদের বড় ছেলে সূর্য্যও এই দ্বন্দ্বের মাঝে পড়ে মার খায়, নেশা ধরে। মেঝো ছেলে অরুণ এক রাতে ঝোঁপের মধ্যে সাপ মারতে গিয়ে সাপের কামড়ে প্রাণ হারায়। এদিকে, আশেপাশের হিন্দু প্রতিবেশীদের স্বপরিবারে ভারত যাত্রা হিরণের মাঝে যেমন গভীর দুঃখবোধের জন্ম দেয় তেমনি নিজ পরিবারের অনিশ্চিত ভবিষ্যত নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে। এর মাঝে অনেকে হিরণদের বাড়ি দেখতেও আসে। তবে এককালের জাঁকজমকপূর্ণ বাড়িটি পরবর্তীতে জরাজীর্ণ হয়ে যাওয়ায় শেষমেষ কেউ আগ্রহী হয়না। এভাবে গল্প এগিয়ে চলে '৬৪ সাল পর্যন্ত। তবুও ওপারে ভালো কোন বিনিময়ের ব্যবস্থা করে উঠতে পারে না হিরণ। সময় গড়িয়ে চলে, বার্ধক্য তিলে তিলে শেষ করে দেয় সব স্বপ্ন-আশা-ভরসা। সরোজিনীর ওপারে গিয়ে বিশ্রামের স্বপ্ন নিঃশেষ হয়ে যায়, সে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে। তাই শেষে হিরণ যখন জানায় যে, আর যাওয়া হচ্ছে না; তখন স্বামীর আনন্দ উপহাসকে অসহ্য লাগে সরোজিনীর। স্বামীর হাত থেকে সেতার নিয়ে আছড়িয়ে ভেঙ্গে ফেলে, জ্বালিয়ে দেয় হারিকেনের আগুনে। এরপর স্বামীকে আঘাত করতে উদ্যত হয়। কালীরূপ ধারণ করে সব ধ্বংস করার খেলায় মেতে ওঠে।

ফলাফল উপস্থাপন:

চিত্রা নদীর পারে (১৯৯৯)

- এক বাঙালি হিন্দু পরিবারের দেশভাগের বেদনাকে উপজীব্য করে নির্মিত চলচ্চিত্র *চিত্রা নদীর পারে।* যার ঘটনা পরম্পরা ১৯৪৭ সাল থেকে শুরু হয়ে ৬০ এর দশক পর্যন্ত। চলচ্চিত্রের পর্দা ওঠে ভগ্নপ্রায় দেয়ালে 'চিত্রা নদীর পারে' লেখা দিয়ে। যেখানে ক্যামেরা লং শট থেকে ধীরে ধীরে ক্লোজ শটে আসার মধ্য দিয়ে দেয়ালটিকে দর্শকের সামনে স্পষ্ট করে হাজির করে। যেখানে অবহেলায় ধ্বংসপ্রায় বাড়িটি ইতিহাসের স্বাক্ষীরূপে অতীতের নানা স্মৃতি, সম্পর্ককে ধারণ করছে এবং ক্রমশ পরিবর্তনকে তুলে ধরছে। নির্মাতা এই লেখাটিকে চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করে দর্শককে কৌতূহলী করে গল্পের ভেতরে নিয়ে যান।
- চলচ্চিত্রে শুরু থেকেই নিজের জন্মস্থান ছেড়ে কলকাতায় পাড়ি না দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন শশীকান্ত এবং মেয়ে মিনতি। তাই বারবার প্রতিবেশীদের দেশত্যাগের প্রশ্নকে সবলে দূরে ঠেলে দিয়েছেন। কিন্তু যতই সময় গড়িয়েছে আর এই সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারেন নি, প্রতিনিয়ত দোদুল্যমানতায় ভুগেছেন। শুরুতে উকিল হিসেবে শশীর পসার রইলেও সময়ের সাথে সাথে তা কমতে থাকে। আবার আদালত পাড়ার লং শটের দৃশ্যেও এটা চোখে পড়ে, যেখানে দেখা যায় দেশভাগের কারণে এ পেশায় মুসলিম আধিক্য বাড়ছিল এবং জমি সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমা বাড়ছিলো। যা নৃপেন, শামসুদ্দিনের সাথে আলাপেও উঠে আসে।

- ওদিকে এলাকার হিন্দু প্রতিবেশীরা অনেকেই শেষমেষ বাধ্য হয়ে ওপারে চলে যাচ্ছিল। যারা রয়ে যাচ্ছিল এটা তাদের জন্যে এক ভীতি ও মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের কারণ হচ্ছিল। মিড শটে নাপিত বিজয়ের সাথে শশীর কথোপকথনের দৃশ্যে গ্রামে বিত্তবান জমিদারসহ কে কে ওপারে চলে যাচ্ছে এমন নানা তথ্য উঠে আসে। নিম্নশ্রেণীর বলে বিজয় দেশত্যাগের প্রসঙ্গে নিজের উত্তর জানিয়ে দেয়, *আমাদের এখানে যা, ওখানেও তা। মানুষের চুল-দাঁড়িই তো কাটতে হবে*। ক্যামেরায় লং শট থেকে মিডিয়াম ক্লোজ আপ শটে শশীর মুখের উদ্বিগ্নতা, হতাশা ফুটে ওঠে। বলে, *যাক। যাক সব। লক্ষ্মণসেনের ব্যাটা সব, পালাতেই পারে শুধু।* শশী বাঙালি হিন্দুদের এই পলায়নপর মানসিকতাকে মানতে না পেরে কটাক্ষ করেন। একসময়ের জমিদারের সাথে সাক্ষাতে গেলে তিনি শশীকে অনেকটা প্রহসনের সুরেই বলেন, *বামন-কায়েত আর থাকবে না, কিছু ধোপা-নাপিত আর গানের মাস্টার রেখে দেবে, আর বাকিসব ওপার*।
- যতীন, নৃপেন এবং শামসুদ্দিনের সাথে শশীর কথোপকথনে দেশভাগের ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং পারিপার্শ্বিক নানা তথ্য উঠে আসে। এই দৃশ্যগুলোতে ক্যামেরার টু শটের মাধ্যমে দর্শককে সচেতনভাবে সমকালীন প্রেক্ষিত এবং এটি দ্বারা সৃষ্ট বহুমুখী সমস্যার বিষয়ে অবগত করেন পরিচালক।
- অপরদিকে গ্রামের মুসলিমদের মধ্যেও ধর্মীয়পরিচয় অধিক গুরুত্ব পাচ্ছিল। দেখা যায়, এক প্রতিবেশী হিন্দু বলে মিনতির ভাই বিদ্যুৎকে 'মালাউন' বলে গালমন্দ করে, পিটুনি দেয়। তীব্র অপমানে কলকাতায় চলে যেতে বায়না ধরে সে। কাউকে প্রকাশ না করলেও এ অপমানের জ্বালা ক্লোজ আপ শটে ছাদে বসে থাকা বিদ্যুতের অভিব্যক্তিতে ফুটে ওঠে। আবার রাত জেগে পড়া বাদল জানালায় দাঁড়িয়ে দেখে একদল তরুণের সেহেরীতে ডাকার দৃশ্য। এখানে মিডিয়াম শটে বাদলের চোখ দিয়ে নির্মাতা দর্শককে এই সামাজিক পরিবর্তনের প্রতি আলোকপাত করালেন।
- মিনতিদের প্রজন্ম অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিশ্বাস করে বলেই বাল্যকালের মতো তরুণ বয়সেও এই চেতনার বাইরে যেতে পারেনি। সালমার সাথে তার বন্ধুত্ব, বাদলের সাথে বন্ধুত্ব-প্রেম কখনোই ধর্মের গণ্ডিতে বাঁধা পড়েনি। আবার সালমাদের বাড়িতে মামার নামাজ পড়ার জায়গা সতর্কভাবে পার হয় মিনতি। যেখানে এক্সট্রিম ওয়াইড শট থেকে ওয়াইড শট ব্যবহার করে অন্য ধর্মের প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধকে তুলে ধরেন পরিচালক।
- মানুষের মধ্যেকার সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থানকে বদলানোর পরিবর্তে দেশভাগ শ্রেণী বিভেদ আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। এ কারণে সমাজের নানা পেশার মত পতিতাবৃত্তিতেও ঢেউ লাগে দেশভাগের। প্রাণভয়ে পতিতালয়ের মেয়েরা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। ভদ্র ঘরের ও রিফুজি মেয়েরা বাধ্য হয়ে এই পেশায় আসছিল। তাই বারবণিতা শশীর সহকারী নিমাইকে বলে, *খদ্দেরের আবার জাত কি ?* এই দৃশ্যে দেখা মিলবে আলো-আঁধারির মধ্যে দাঁড়ানো পতিতাদের চেহারা এবং পরের শটেই আয়নায় এক পতিতার স্পষ্ট চেহারা।
- চলচ্চিত্রে শিশুদের একসাথে খেলাধূলা অসাম্প্রদায়িক চিন্তা ও সম্প্রীতির বার্তা দেয়। আবার ভিন্নদিকে বড়দের ভাবনা ও অস্বস্তিকে তুলে ধরে। সমকালীন সমাজ বাস্তবতা ও বৈপরীত্য উঠে আসে মিনতির শিশুকালে বন্ধুদের সাথে খেলায়। তারা নদীর পাড় ধরে খেলার সময় খেলাচ্ছলে নিজেদের মধ্যে নানা বিষয়ে কথা বলে। যেখানে উঠে আসে ওই সময়ের বাস্তবতার চিত্র। হিন্দু বলে মিনতিরা কলকাতায় চলে যাবে কিনা বা যার নিজের বাড়ি নেই সে হতভাগা এসব নানা বিষয়ে কথা বলে।

- চলচ্চিত্রে রেডিওতে ভারত এবং বাংলার বিভিন্ন জায়গায় দাঙ্গা, সহিংসতার খোঁজ পাওয়া যায়। শশীর পরিবারকেও দুশ্চিন্তায় পড়তে হয় আশু বিপদ নিয়ে। এক্ষেত্রে ধর্মীয় বিদ্বেষের পাশাপাশি অসাম্প্রদায়িক চেতনাও উঠে এসেছে। গ্রামে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে মনুষ্যত্ব হারিয়ে যায় না। যেখানে বন্ধু শামসুদ্দিন শশীকে সহায়তা করে। মিনতি-সালমার বন্ধুত্ব তাদের ধর্মীয় পরিচয়কে ছাপিয়ে যায়। সালমাদের বাড়িতে সবসময়েই মিনতি আকাঙ্ক্ষিত থাকে। বাদলের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেও একদিকে বন্ধুরা যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান গাইছে, আবার পরক্ষণেই মিছিলের কথা শুনে কাজী নজরুল ইসলামের 'কারার ঐ লৌহ কপাট...' গাইছে। সংস্কৃতিগত এই সম্মিলন আপামর বাঙালির মনের অসাম্প্রদায়িক ভাবকেই মূর্ত করে তোলে।

- মানুষে মানুষে সীমান্ত রেখার সাথে আর্থিক সংকটে পড়ে যাওয়া মানুষের সংখ্যাও নেহায়েত কম ছিলো না। চলচ্চিত্রে পাশের বাড়ির মেয়েটি মিনতির কাছে অর্থ সাহায্যের জন্যে আসে। নানা সংকটে পড়ে একসময় ভিটেমাটি ছেড়ে যেতে উদ্যত পরিবারের নারীরা ক্রমাগত কেঁদে চলে। তাদের এই কান্না ও আবহসঙ্গীত ইঙ্গিত দেয়, সব ছেড়ে ওপারের জীবন আরো কঠিন এবং অনিশ্চিত।

- নির্মাতা মন্তাজের ব্যবহার করেছেন যেখানে বিদ্যুৎ কলকাতায় চলে গেলে খেলার সময় কলকাতায় মজা করছে কীনা মিনতিকে এই প্রশ্নের পরেই কাট থেকে পরের শটে দেখা যায় বৌদির সাথে শশীর কথোপকথনে এর জবাব। যেখানে শশীকান্ত বলে সেখানে জীবন আরো কঠিন, সমস্যাসংকুল। অল্প জায়গায় বহুমানুষকে একসাথে বাস করতে হচ্ছে। 'বাস্তহারা', 'রিফিউজি' নানা শব্দ ব্যবহার করে এই দুর্দশাকে প্রকাশ করা হচ্ছে। অর্থের অভাব, চাকরির সংকট সবকিছু মিলে সেখানেও জীবন ও সামাজিক নিরাপত্তার তীব্র সংকট। এ প্রসঙ্গে শশীর বন্ধু নৃপেন মাস্টার তাকে জানায়, '*ওপারে বামনকায়েতের ছেলেরা নিচু জাত হিসেবে নাম লেখাচ্ছে, কেননা এতে চাকরি পাবার সুবিধা। চাকরি আর কয়টা, হাজারে হাজারে রিফুজি।*'

- দেশভাগের অব্যবহিত পরে মুসলিম অধ্যুষিত অংশের হিন্দুদের জন্যে বড় সংকট ছিল নিরাপত্তাহীনতা, আস্থার অভাব এবং ভয়। সংখ্যালঘু পরিবারগুলো প্রতিনিয়ত সম্মান, মর্যাদাহানির ভয়ে থাকত। যা রক্ষার নিশ্চয়তা অনেক সময় ভিন্ন ধর্মের, স্বল্পসংখ্যক সচেতন অংশের পক্ষেও পুরোপুরি দেয়া সম্ভব হয়নি। এজন্যে প্রতিদিনই কারো না কারো ওপারে চলে যাবার সংবাদ মিলত। মিনতি যশোরে বেড়াতে গিয়ে বৌদির প্রশ্নের জবাবে বলে, *যাবো না।* ক্লোজ আপ শটে তার কণ্ঠের দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। শশীর ভাই নিধুকে বৃদ্ধ এক খুড়ো বলে, *যাতি তো হবেই, আজ কিংবা কাল।* এসব নিয়ে ভাবনায় হৃদরোগী শশীর শারীরিক অসুস্থতা বেড়ে যায় এবং চিত্রার পাড়ে মাথা ঘুরে পড়ে মারা যায়। প্রেমিক বাদলের পর বাবাকে হারিয়ে তাই একসময় মিনতি ওপারে চলে যাওয়াকেই শ্রেয় মনে করে।

খাঁচা (২০১৭)

- *খাঁচা* চলচ্চিত্রে নির্মাতা গল্পের পুরো সময়কালকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে দেশভাগের প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরেছেন। শুরুতে ১৯৪৮, যেখানে পোস্টঅফিসে বাড়ি বনিবনার চিঠির খোঁজ নিতে দেখা যায় হিরণকে। পর্দায় এস্টাবলিশিং শটে 'পোস্টঅফিস' লেখা এবং দেখা যায় ঘটনাস্থল মুকিমপুর, যশোর। এই দৃশ্যে খুব দক্ষতার সাথে নির্মাতা যেন এক গল্পের দিকে দর্শককে সযত্নে টেনে নিয়েছেন, যেখানে মূখ্য হলো অপেক্ষা। শুরুতে সিল মারার শব্দ এবং এক্সট্রিম ওয়াইড শট পুরো গল্পের পরিবেশকে তুলে ধরে।

- এরপর গল্পে আসে ১৯৫৩, যেখানে এক পার্টি আসে বাড়ি দেখতে। এরপরে ১৯৫৪ তে সরোজিনী স্বপ্নের জাল বুনতে থাকে যে পরিবারসহ ওপারে যাচ্ছে। ১৯৫৭ তে অবশেষে বাড়ি বিনিময়ের বনিবনা পাকা হতে যাচ্ছে বলে জানায় হিরণ। সবশেষে ১৯৬৪ সাল যেখানে হিরণ তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানায় যে তারা আর যাচ্ছে না।
- দেশভাগের প্রেক্ষাপটে হিরণ-সরোজিনীর পরিবার সবসময়ে চেয়েছে বাড়ি বিনিময়ের মধ্য দিয়ে এপার ছেড়ে ওপারে চলে যেতে। কিন্তু সময় গড়ায়, তাদের বয়স বাড়তে থাকে, শেষমেষ আশায় আশায়ই দিনগুলো ফুরিয়ে যায়। কারণ প্রতিনিয়ত নানাভাবে চেষ্টা করেও একাজে সফল হয়নি হিরণ। যথাযথ পার্টির অভাব, নানা বায়না, সরকারী নিয়ম-নীতি এসব কারণে বনিবনার মাধ্যমে তাদের কাঙ্ক্ষিত যাওয়া হয়ে উঠছিলো না। ছোট দুই সন্তানের পড়ালেখাও বন্ধ হয়েছিলো ওপারে গিয়ে নতুন করে স্কুলে ভর্তি করাবে ভেবে। মনের অস্থিরতায় আর ওপারে যাবার আশায় তাদের দিনগুলো ক্লান্ত আর অবসন্ন হয়ে যায়।
- আবার এপার-ওপার সবখানের অবস্থা জেনে হিরণ ক্রমেই বুঝতে পেরেছিলো যে দেশভাগ তাদের জন্য কেবল অনিশ্চিত যাত্রা নিয়ে হাজির হয়েছে। হিরণ চরিত্রের মধ্য দিয়ে বাড়ি বিনিময়ের প্রবল চেষ্টার পাশাপাশি সংশয়কে তুলে ধরেছেন পরিচালক। ক্যামেরার লং শট থেকে ক্লোজ আপ শটে তার ব্যক্তিজীবনের বেদনা, বাড়ির প্রতি টান এবং স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি মায়ার প্রকাশ ঘটে। একসময় দেশত্যাগের চিন্তা বাদ দেয় হিরণ, স্ত্রী সরোজিনীকে বলে, *যাইয়েই বা লাভ কী ? সব এক।* এপারে ভবিষ্যতের শঙ্কা, নিরাপত্তাহীনতার ভয় আর ওপারে রিফিউজির তকমাই জুটবে কেবল। তাই চলচ্চিত্রের এক পর্যায়ে হিরণ সরোজিনীকে বলে, *আমরা তো নেই, একপ্রকার মইরেই গেছি।*
- একদা আর্থিকভাবে অবস্থাসম্পন্ন হলেও দেশভাগ পরবর্তীকালে বিরাট সংকটে পড়ে যায় পণ্ডিতমশাইয়ের পরিবারের মতো অনেক পরিবার। হিরণ ও তার পিতার মধ্যেকার কথোপকথনে তা উঠে আসে। এখানে জানালার বিপরীত থেকে ক্যামেরায় পিতা-পুত্র। পরের শটে টেবিলের দু'পাশে, যেন তাদের ভাবনার দূরত্বকে তুলে ধরে। ক্রমাগত আর্থিকচাপে জমিজমা হারিয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা চালিয়ে নিতান্ত সামান্য আয় করে। হিরণ বয়স্ক, শারীরিক দুর্বল পিতাকে কাজ করতে দিতে চায় না। তার পয়সা গোনার মধ্য দিয়ে বোঝা যায় রোগীরাও আর্থিকভাবে ক্লিষ্ট।
- হিরণ দেশে রয়ে গেলেও একান্নবর্তী পরিবারের বাকিরা ওপারে চলে গিয়েছিলো। এদিকে হোমিওপ্যাথি ডাক্তার হিরণের উপার্জনও দিনে দিনে কমতে থাকে। অর্থের বদলে রোগীরা কেউ পেয়ারা কিংবা চাল নিয়ে আসে। আর্থিক সংকটে আর ওপারে যাবার চিন্তায় তাদের মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন চলে। তাই রোগীর সামনে সন্তানদের নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হয় সরোজিনী ও হিরণ। ক্যামেরায় লং শট থেকে মিডিয়াম ক্লোজ আপ শটে হিরণ, সরোজিনীর মুখের ক্রুদ্ধতা দেখা যায়।
- এদিকে সংসারের নানাবিধ সংকটে নিজেদের সব শখ-আহ্লাদ চাপা পড়ে, তাই গান-সেতার সবই পড়ে থাকে। একসময় হিরণের বাবাও পক্ষাঘাতে পড়ে শয্যাশায়ী হন। যেখানে দেখায় মিডিয়াম ক্লোজ আপশটে সরোজিনী-হিরণের আতঙ্কিত চেহারা। দেশত্যাগের আশায় এভাবে যেন ক্রমেই তাদের পরিবারের ভগ্নদশা হতে থাকে। পরিবারের বোঝা হবার ভয়ে পণ্ডিতমশাই তাকে মেরে ফেলতে বলেন। এখানে লং শট থেকে মিডিয়াম শটে এই টানাপোড়েন পরবর্তী প্রজন্মকে কীভাবে মনুষ্যত্বহীন করে তুলছিলো তা উঠে আসে।

- এক পর্যায়ে এপারে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাড়ে এবং দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মাঝে ক্রমান্বয়ে দ্বন্দ্বও বেড়ে যায়। তাই চিঠির খোঁজে গেলে পোস্টমাস্টার হিরণকে বলে, *কোন মুখে তোমাদের থাকতে বলবো*। এই সংকটে নষ্ট হতে থাকে পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ। সরোজিনী-হিরণের বড় ছেলে সূর্য্য এই দ্বন্দ্বের মাঝে পড়ে, বন্ধুদের হাতে মার খায়। ব্যর্থতার আক্ষেপ ঢাকতে নেশা করে। বখে যায়, বাড়ির সকলের সাথে দুর্ব্যবহার করে। মেঝো ছেলে অরুণ ছোট থেকেই ভীষণ রাগী, এই মার খাওয়া আর অক্ষমতাকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে না। আবার রাগ দেখানোর জায়গাও খুঁজে পায়না। তাই নিজের মার ওপর যেমন সে রাগ দেখায় তেমনি সাপ, তক্ষক কিংবা অন্য প্রাণীগুলোকেও সহ্য করতে পারে না।
- একসময় এই ভগ্নপ্রায় বাড়িতে তক্ষক পাওয়া যায়। হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীমতে এটি অষ্টরাগের অন্যতম। মহাভারত মতে, একে সৌভাগ্য ও উর্বরতার প্রতীক বলে ধরা হয়। কিন্তু তক্ষক দেখে তার দাদার খুশিতে অরুণ বিরক্ত হয়। এখানে ডিপ ফোকাসের ব্যবহার করে একই সাথে অরুণ-পণ্ডিতমশাই ও সরোজিনীর অভিব্যক্তি দেখিয়েছেন নির্মাতা। এমন কোন এক রাতেই ঝোঁপের মধ্যে সাপ মারতে গিয়ে সাপের কামড়ে প্রাণ হারায় অরুণ। মারা যাবার সময় মায়ের কোলে শুয়ে অরুণ তাই যেন ক্ষেদোক্তি করে, *তোমরা কেউ আটকাতে পারবে না আমারে, কলা দেখিয়ে চলে যাবো.. ।*
- ওদিকে এদেশে পাড়ি জমানো মুসলিম পরিবারগুলোও ভাল নেই। খাদ্যাভ্যাস আলাদা, ভিন্ন পরিবেশ আর অর্থের সংকটে কোনোমতে শুধু ভাত খেয়ে বেঁচে আছে। শুকনো দেশের বলে বাড়ির আঙ্গিনায় শাকসব্জি ফলানোও তাদের দ্বারা সম্ভব হয় না। আবার মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারের দাবি করলেও পেটের তাগিদে ঘরের মেয়েকে অন্য পুরুষের শয্যাসঙ্গী হতে হয়। এমনই একজন জমির শেখ হিরণকে বলে, *ফুলের বীজের জন্যে করবী গাছ লাগিয়েছি। এতে চমৎকার বিষ হয়।*
- সরোজিনীকে এই চলচ্চিত্রে আদর্শ বাঙালি নারীর প্রতিভূ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন নির্মাতা। যে দক্ষ হাতে পুরো সংসার সামলায়। বৃদ্ধ শ্বশুর, স্বামী এবং সন্তানের দেখভালের পাশাপাশি তাদের নানা আবদার মেটায়। বাড়ি বিনিময়ের মাধ্যমে ওপারে গিয়ে আবার নতুন করে সবকিছু শুরু করবে এমন স্বপ্ন দেখে। সদাকর্মব্যস্ত সরোজিনী যেন ক্লান্ত, শ্রান্ত তাই ওপারে গিয়ে বিশ্রামের স্বপ্ন দেখে, চায় স্বামী যেন তাকে এখানকার মত বাগান করে দেয়। যেখানে সে মনের মতো গাছ লাগাতে পারবে, যত্ন করতে পারবে। সরোজিনী স্বপ্নে দেখে পরিবার নিয়ে নৌকায় দেশ ছেড়ে যাচ্ছে। শুকনো এলাকা নাকি পাহাড়ি এলাকা, নাকি কোন গাছপালা ঢাকা ছায়া সুনিবিড় এলাকায় বাড়ি বিনিময় করবে তা নিয়ে পরিকল্পনা সাজায়।
- দেশভাগের কারণে ক্রমশ অসীম সংকট, ওপারে না যেতে পারা, সন্তান হারানো এসব ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে সরোজিনী। তার সব ক্রোধ গিয়ে পড়ে স্বামী হিরণের ওপর, অন্যদিকে হিরণ নিজের অক্ষমতায় নিশ্চুপ হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে। সময় বয়ে চলে, নানা নতুন বায়না শোনা যায়। কিন্তু পুরনো এই বাড়ি বিনিময়ে কেউ আগ্রহী হয় না, শেষমেষ তাদের থেকে যাওয়াই চূড়ান্ত হয়। এতে ক্ষোভে ফেটে পড়ে সরোজিনী। এমনকি স্বামীকে আঘাত করতেও উদ্যত হয়। মৃত্যু ভয়ে ভীত হিরণ বলে ওঠে, *সরোজিনী, আমি নই, আমাকে নয়।* এই পুরো দৃশ্যটিকে কয়েক অংশে ভাগ করে এক্সট্রিম ওয়াইড শট থেকে মিডিয়াম ক্লোজ আপ শটে ক্যামেরায় যেন পরিস্থিতির গভীরতা তুলে ধরেন পরিচালক। যেখানে সরোজিনী ক্রোধোন্মত্ত অবস্থায় দেবী দুর্গার বিনাশী কালীরূপ ধারণ করে যেন সবকিছু ধ্বংসের খেলায় মেতে ওঠে।

- সরোজিনী চরিত্রটিকে তরুণ থেকে পরিণত বয়সের চেহারা, অঙ্গভঙ্গিকে বোঝাতে মিডিয়াম ক্লোজ আপ শট ও ক্লোজ আপ শট ব্যবহার করা হয়েছে। চলচ্চিত্রে এই চরিত্রটিকে বহুমাত্রিকভাবে তুলে ধরেছেন নির্মাতা যেখানে প্রেমময়ী স্ত্রী, মাতা এবং বউ হিসেবে তার রূপ। আবার শেষে এই চরিত্রই বিনাশী রূপ ধারণ করে, প্রতিনিয়ত আশা-নিরাশার সকল ধূম্রজাল ছিঁড়ে ফেলে।

বিশ্লেষণঃ

মর্মন্তুদ, বিভীষিকাময় এক সময়ের আখ্যান

দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষের অবসানে হিন্দু-মুসলিম দুই ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগকে সমাধান হিসেবে দেখালেও বাস্তবে দেশভাগ পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে বসবাসকরা জনগোষ্ঠীর জন্যে আশীর্বাদ নয় বরং বিভীষিকাময় হয়েই এসেছে। '৪৭ এর দেশভাগের প্রেক্ষাপট নিয়ে নির্মিত নমুনায়িত চলচ্চিত্র দু'টিতেই নির্মাতারা বিভিন্ন চরিত্র এবং ঘটনার উল্লেখপূর্বক বিষয়টিকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। *চিত্রা নদীর পারের* প্রথম দৃশ্যে ভগ্নপ্রায় দেয়ালে লেখা চিত্রা নদীর পারে এবং *খাঁচায়* পোস্টঅফিসের নাম এস্টাবলিশিং শটের মধ্য দিয়ে দর্শককে কাহিনীর স্থান এবং কালের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন নির্মাতাদ্বয়।

চলচ্চিত্রে কাহিনী, চিত্রনাট্যের পাশাপাশি সেট বাছাইয়ের মধ্য দিয়ে শটের অর্থপূর্ণ ও নান্দনিক ব্যবহার আবহমানকাল ধরে বাঙালির যাপিত জীবনকে নানা আঙ্গিকে তুলে ধরেছে। এক্সট্রিম লং শট থেকে ক্লোজ শটে নদী, নদী পাড়ের মানুষ, তাদের জীবন ও অনুষঙ্গ এই বিষয়ের গভীরতা ও বাস্তবতাকে বুঝিয়েছে। দু'টি চলচ্চিত্রেই নদী ও প্রকৃতিকে মানুষের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে বোঝাতে ক্যামেরায় ব্যবহৃত হয়েছে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল শট। দেশভাগের পরে অর্থের অভাবে সংস্কার করতে না পারায় একদা অবস্থাসম্পন্ন বাড়ি অযত্নে ভগ্নপ্রায় হয়ে উঠছিলো। তাই হিরণ বা শশীর বাড়ি যেন কালের সাক্ষ্য বহন করছে।

*চিত্রা নদীর পারে*তে চুল কাটার দৃশ্যে গ্রুপ শট ও সংলাপ পারিবারিক মেলবন্ধনকে তুলে ধরার পাশাপাশি দেশত্যাগের বাস্তবতাকে চিত্রিত করেছে। এর মধ্য দিয়ে সাংঘর্ষিকভাবে আনন্দের মুহূর্তের পাশাপাশি জীবনের অনিশ্চয়তা ফুটে উঠেছে। শুরুতেই ওয়াইড অ্যাঙ্গেল শটে চিত্রাকে দেখা যায়। চলচ্চিত্রের ন্যারেটিভে উঠে আসে নৌকা থেকে নামা শশী উকিল ও তার চারপাশের সুসজ্জিত ডিটেইলস যা তুলে ধরে নদী পাড়ের জীবনযাত্রা। রাজীদ (২০২১) এই চলচ্চিত্রের ন্যারেটিভ কৌশলের পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন, দর্শক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোনো কিছু শেষ হয়ে যাবার এক করুণ অনুভূতি যেন বোধ করে। চলচ্চিত্রের পরবর্তী অংশগুলো দর্শককে শশী, তার পরিবার ও চিত্রা নদী পাড়ের অঞ্চলের সংখ্যালঘুদের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও এক গভীর হতাশাবোধের সঙ্গে ক্রমান্বয়ে সংলগ্ন করে ফেলে (সিজন, ২০২১: ১০০)।

প্রথমাংশে লং শটে পাখি ওড়ার দৃশ্য, সাথে খেলাচ্ছলে শিশুদের আহবান যেন সম্প্রীতির বার্তাকেই তুলে ধরে। আবার সন্ধ্যায় আজানের দৃশ্যের পরেই সান্ধ্যপূজার ধ্বনি ধর্মীয় সম্প্রীতির বার্তা দেয়। নমুনায়িত চলচ্চিত্রগুলোতে দেখা যায়, দেশভাগের কারণে সম্প্রীতির জায়গায় ক্রমে জায়গা করে নিয়েছিল সাম্প্রদায়িকতা। তাই পূর্ব পাকিস্তান হবার পরে বাধ্য হয়ে যে সব হিন্দুরা চলে গিয়েছিলো এবং যারা থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো তারা কেউই ভাবতে পারেনি তাদের ভবিষ্যৎ কী বা সামনে কী অপেক্ষা করছে ? কিন্তু যতই সময় যাচ্ছিল বিভিন্ন জায়গা থেকে দাঙ্গা, দ্বন্দ্বের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছিলো। *চিত্রা নদীর পারে* চলচ্চিত্রে বেতার সংবাদে, নৃপেন ও কমরেড যতিনের কথায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, অস্থিরতার কথা জানা যায়। আবার *খাঁচা*তে পোস্টমাস্টারের কাছে হিরণ দাঙ্গা নিয়ে জানতে

পারে। এই দৃশ্যগুলোতে লং শটের ব্যবহার চরিত্র এবং তাদের পরিবেশকে তুলে ধরেছে। প্রকৃতপক্ষে দেশভাগ তৎকালীন প্রেক্ষিতে এই অঞ্চলের বাঙালির জীবনযাত্রায় বড় পরিবর্তন নিয়ে এসেছিলো। যা পরবর্তী কয়েক দশকেও নানাভাবে প্রভাব ফেলেছে।

সত্যজিৎ রায়ের *পথের পাঁচালী*র মত *চিত্রা নদীর পারে* চলচ্চিত্রটিতে বাঁশি ও সেতারের সম্মিলন 'সিগনেচার টিউন' বা পরিচিত সংগীত হিসেবে নন্দিত হয়েছে। এটি একই সাথে দেশভাগের বেদনাবিধূর ইতিহাস এবং স্থান ও কালকে ধারণ করছে। আবার *খাঁচায়* সেতার, বাঁশির আবহসংগীতের সুর যেন যাপিত জীবনের বেদনা ও সুখস্মৃতিকে তুলে ধরছে।

মানবিক টানাপোড়েনের করুণ চিত্র

সরোজিনী-হিরণ বা মিনতি-শশীর জীবনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল দেশভাগ। তাই প্রতিনিয়ত টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে তাদের। দেশভাগের কারণে অনেক বাঙালি অবস্থাসম্পন্ন পরিবার পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়েছিলো। তাদের আর্থিক, সামাজিক নানা সমস্যা ক্রমান্বয়ে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা তৈরি করে। দেশত্যাগ করবে কি করবে না সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে, টিকে থাকার উপায়ান্তর খোঁজে। নিজ জন্মভূমির স্মৃতির দহনে পোড়ে, আবার ভবিষ্যতের চিন্তায় কাতর হয়। মিডিয়াম ক্লোজ আপশট থেকে ক্লোজআপ শটের ব্যবহার চরিত্রদের অন্তর্ভাবনাকে তুলে ধরে। মিনতি বা সরোজিনী প্রত্যেকেই নিজেদের ভগ্নপ্রায় বাড়িটিকে প্রতিমুহূর্তেই গভীরভাবে অনুভব করে আবার ভবিষ্যতের ভাবনায় বিলীন হয়।

লং শটে প্রকৃতি, নদী সবকিছুর সাথে নানা ঘটনা ক্ষণে ক্ষণে স্মৃতিপটে উঁকি মারে। তাই পিসি মিনতির সাথে নদীতে স্নান করতে গিয়ে এই নদী দিয়েই তার বিয়ে এবং বিধবা হবার স্মৃতি রোমন্থন করেন। আবার সরোজিনী নবপরিণীতা হিসেবে নিজেকে ফ্ল্যাশব্যাকে দেখে, যৌথপরিবারের সকলকে স্মরণ করে। এভাবে প্রতীকীরূপে একই নদী, প্রকৃতি, ফটোফ্রেম মানুষের জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতকে নীরবে ধারণ করে চলে।

মাতৃভূমি থেকে উৎখাত হওয়ার বাস্তবতা, উদ্বাস্তু সহস্র মানুষের দেশত্যাগ, সাম্প্রদায়িক ধর্ষণ, অপহরণ, বলপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ প্রভৃতি নির্মম ঘটনা দিয়ে নির্মিত হয়েছে দেশ বিভাগ নামক দেশ ব্যবচ্ছেদ, যা সংঘটিত হয়েছিলো একটি নির্দিষ্ট কালব্যাপী এবং অব্যাহত থেকেছিলো সরকারিভাবে বিভক্তিকরণের প্রায় অনেক দিন পর পর্যন্ত (আহমেদ, ২০২১)। *চিত্রা নদীর পারে*'তে দেশবিভাগোত্তর পূর্ব বাংলার সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং নৃপেন, যতিনদের সাথে কথা বলে শশীকান্ত দেশত্যাগ না করার বিষয়ে অটল থাকলেও মানসিক টানাপোড়েনে ভোগে। তার মনে দেশত্যাগের দুঃস্বপ্ন ভর করে। ক্যামেরার ক্লোজআপ শটে তার অভিব্যক্তি অন্তরের যাতনাকে তুলে ধরে।

চলচ্চিত্রটিতে আবহসঙ্গীতের মধ্য দিয়েও দেশভাগের যাতনা ব্যাপকতা পেয়েছে। যেখানে একটি দৃশ্যে দূরে গান বাজে, 'পরের জায়গা, পরের জমিন, ঘর বানাইয়া আমি রই, আমি তো সে জমির মালিক নই...'। চলচ্চিত্রের এক পর্যায়ে বোন অনুপ্রভার গাছ লাগানোকে উদ্দেশ্য করে ভবিষ্যত নিয়ে অনিশ্চয়তা প্রকাশ করে শশীকান্ত। এরপরের শটে সকল ধর্মীয় বিধিনিষেধের বেড়াজালের অস্বস্তিকে যেন নির্মাতা কটাক্ষ করেন শশীর মাধ্যমে; যেখানে ক্লোজআপ শটে দেখা যায় অনুপ্রভার বিব্রত মুখভঙ্গি।

আবার দেশ ছাড়লেও নিজ মাতৃভূমির প্রতি টান ভোলে না। তাই ওপারে গিয়ে নিম গাছ নিয়ে জানতে চায় নিধু। কিংবা হিরণের বাবা বন্ধু নলিনীর বাড়িতে নিম গাছটার খোঁজ নেয়। সান্ধ্যপ্রদীপ জ্বালানো, উলু ধ্বনি, গীতা পাঠ, দুর্গাপূজা অনুষ্ঠান এসব কিছুই হিন্দু ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ যা ব্যবহৃত হয়েছে চলচ্চিত্র দু'টির ন্যারেটিভে।

চিত্র-৩: *চিত্রা নদীর পারে*'র একটি দৃশ্য

দেশবিভাগে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিনিময়ের মাধ্যমে পূর্ব বাংলা থেকে কলকাতা যাওয়া বা কলকাতা থেকে পূর্ব বাংলায় আসা ছিল একটি সাধারণ প্রবণতা। *খাঁচা* চলচ্চিত্রে বাড়ি বিনিময়ের মাধ্যমে ওপারে যেতে না পারায় হিরণের সন্তানদের লেখাপড়া থেমে যায়, বখে যায়। ক্রমশ পুরো পরিবার যেন থমকে যায়। স্ত্রীর সাথে দাম্পত্যেও এর প্রভাব পড়ে যেখানে হিরণের বিনিময়ের চেষ্টায় আর আস্থা রাখতে পারে না সরোজিনী। আবার ভগ্নপ্রায় বাড়ি বিনিময়ের আপ্রাণ চেষ্টা করলেও বাড়ির প্রতি মায়ার টানকে অবহেলা করতে পারে না তারা। ক্যামেরায় মিড শট থেকে ক্লোজ আপে হিরণ-সরোজিনীর চেহারার এই অস্বস্তিভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এজন্যেই পুরো বাড়ি ব্যবস্থাপনার অভাবে জঙ্গলে ভরে গেলেও মায়া কাটাতে পারে না, সব ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্তে অস্বস্তিতে ভোগে। আবার চলচ্চিত্রের শেষে না যাবার সিদ্ধান্তে যেন একপ্রকার স্বস্তিবোধ করে।

চলচ্চিত্রে বনিবনা করতে আসা ব্যক্তিরা বাড়িটা পুরনো, জরাজীর্ণ বলে জানালে হিরণ যখন বলে, *ওই, যাই যাই করে বাড়িটা ঠিক...।* সামনে দরজায় দাঁড়ানো স্ত্রীর দিকে চোখ পড়ে তার। মিডিয়াম

শটে দর্শক দেখেন সরোজিনীর চেহারায় একই সাথে ভর করে আছে আশা-নিরাশা। এর সাথেই হিরণের বাবার কাশি যেন বলে দেয় এ ভাবনা, প্রচেষ্টায় পার হয়ে গেছে কত সময়।

নারীর দৃষ্টিতে দেশভাগের বেদনার উপস্থাপন

মূলধারার বিকল্প ধারার চলচ্চিত্র[১] হিসেবে দু'টি চলচ্চিত্রেই দেখা যায় নারীকে মূখ্য চরিত্রে রেখে ন্যারেটিভের বুনন। তাই ঋত্বিক ঘটক-এর *মেঘে ঢাকা তারা* (১৯৬০)-র ন্যায় নারীর দৃষ্টিতে খুব গভীরভাবে দেশভাগের বেদনার বয়ান এই দু'টি চলচ্চিত্র। এক্ষেত্রে শশী ও মিনতির ভাষ্য যেমন এসেছে, এসেছে সরোজিনী ও হিরণের ভাবনাও।

চিত্রা নদীর পারে চলচ্চিত্রের গল্প শুরু হয় শশী উকিলকে নিয়ে, তারপরে মিনতির বাল্যকাল থেকে কাহিনী এগোয় তরুণী মিনতিকে নিয়ে। যেখানে মিনতি-বাদলের অসাম্প্রদায়িক ভাবনা এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে বাল্যপ্রেম নতুন মোড় নেয়। ধর্মের উর্ধ্বে তা যেন মানব-মানবীর প্রেমকে প্রতিফলিত করছে। আবার চিঠি দেয়া প্রসঙ্গে তাদের অন্তরঙ্গ আলাপের দৃশ্যটিতে গরুর হাম্বা শব্দটিকে পরিচালক এক দ্যোতক রূপে তুলে ধরেন। এই প্রাণীটিকে নিয়ে এ উপমহাদেশে যে ধর্মীয় রেষারেষি বিদ্যমান কৌশলে তিনি যেন একেই উপহাস করলেন।

ন্যারেটিভে শশীর পরে মিনতির চরিত্রের মধ্য দিয়ে তৎকালীন ঘটনা পরম্পরা এবং তার অভিজ্ঞতার বয়ান উঠে আসে। মিনতি অসাম্প্রদায়িক মুক্ত মন নিয়ে বেড়ে ওঠার কারণে প্রথমদিকে দেশত্যাগের বাস্তবতাকে গ্রহণ করতে চায়নি। কিন্তু তার দৈনন্দিন জীবনের ছন্দে একসময় ভাটা পড়ে বাদলকে হারিয়ে, তারপর পিতাকে হারিয়ে। তাই শেষে সব ছেড়ে চলে যাবার কঠোর সিদ্ধান্ত নেয়।

আবার *খাঁচা*তে সরোজিনীর গান শুনেই ছেলের বউ করে এনেছিলেন পণ্ডিতমশাই। কিন্তু দারিদ্র্য আর সংসারের ঘানি তার সে গুণটিকেই যেন নষ্ট করে দিয়েছিলো। এজন্যই বহুদিন পর সরোজিনী গান গেয়ে উঠলে বাড়ির সকলে মুগ্ধ হয়। ওয়াইড অ্যাঙ্গেল শটে দেখা যায় এ গান যেন বহুদিন পরে কিছুটা হলেও প্রাণ ফিরিয়ে দেয় একদা প্রাণচঞ্চল এ বাড়ির সকলকে। তাই গান বন্ধ প্রসঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ফেলে শ্বশুরকে সরোজিনী বলে, *আর গান বাবা!*

খাঁচা চলচ্চিত্রে পরিবারের এক পুরনো ফটোফ্রেমকে পরিবর্তনের প্রতীকরূপে নির্মাতা কাহিনীর দুই জায়গায় তুলে ধরেছেন। প্রথমবার এক অতিথির সামনে এবং পরেরবার যখন দেয়াল থেকে ছবিটি পড়ে যায়। বাড়ি দেখতে আসা ওপারের মুসলিম ধনী ব্যক্তিদের দল যখন পুরো বাড়ির চারপাশ ঘুরে অন্দরে প্রবেশ করছিলো ক্যামেরা ঘুরে কাপড় নাড়তে থাকা সরোজিনীকে দেখা যায়। সকলে তার সামনে দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে, পেছনে সে। অভিব্যক্তিতে আশা এবার বুঝি বাড়ি বিনিময় হবে। কাট করে এরপরেই ক্লোজ আপ শটে দেয়ালে ঝুলানো পুরনো ফটোফ্রেম দেখা যায়। অভ্যগত একজন বলেন, *ফ্যামিলি ফটো। তা এতসব মানুষ গেলো কোথায় ? এ যেন দর্শকদেরই এক প্রশ্ন।* যেখানে এই বাড়ির ঐতিহ্য এবং একসময়ের সরগরম পরিবেশ আঁচ করতে পারা যায়। কালের প্রভাবে যা ক্রমশ হারিয়ে গেছে। এখানে ডিপ ফোকাসের ব্যবহার করে ছবিটির সামনে দাঁড়ানো ব্যক্তিটির সাথে পেছনের মানুষগুলোকে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। চরিত্রগুলোর কথোপকথনে এ বাড়ির এককালের হারানো জৌলুস সম্পর্কে দর্শক অবগত হন। এভাবেই ডিপ ফোকাসের নান্দনিক ব্যবহার চরিত্রগুলোর অভিব্যক্তিকে দারুণভাবে প্রকাশ করেছে।

---

১. বিকল্প ধারার চলচ্চিত্রঃ মূলধারার বিপরীতধর্মী চলচ্চিত্র। যা বিষয়বস্তু, আধেয়, ধরন, নির্মাণশৈলী, অর্থায়ন ইত্যাদি দিক বিবেচনায় প্রথাগত ইন্ডাস্ট্রিধর্মী চলচ্চিত্রের বিপরীত। এদেশে আশির দশকে এ ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হয়।

এখানে ফটোফ্রেমটি যেন একটি পরিবারের সুন্দর সময়ের পাশাপাশি দুর্গত কালকে ধারণ করছে, যা ন্যারেটিভে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। ফটোফ্রেমটিকে কেন্দ্র করে ফ্ল্যাশব্যাকে দেখা যায় একান্নবর্তী পরিবারের সদস্যদের ভালবাসা, আবেগ। ছবি তুলতে গিয়ে সাজসজ্জা, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সুন্দর সময়। কালের পরিবর্তনে ও ওপারে যাবার ভাবনা দেবীর মত সরোজিনীকে একসময় ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত করে তোলে। ওপারে যাবার স্বপ্নদৃশ্যের পরে ক্লোজআপ শটে সরোজিনীর মুখের হাসি মিলিয়ে যায়, স্বপ্ন আর বাস্তবতাকে আলাদা করে ফেলে।

আধেয় বিশ্লেষণে দেখা যায়, তৎকালে পরিবারগুলো তাদের সন্তান এবং নারী সদস্যদেরকে নিয়ে আতঙ্কে থাকতো। সংখ্যালঘু শিশুদের হেনস্তা, মারপিট করা হত এবং বিধবা ও অবিবাহিত নারীদের চিহ্নিত করে অপমান, শারীরিকভাবে লাঞ্ছনা করে পরিবারকে ভয়ভীতি দেখানো হত যেন ওপারে চলে যায়। এরপর তাদের ফেলে যাওয়া বসতভিটা, জায়গাজমি স্বল্পমূল্যে কিংবা নামমাত্রমূল্যে দখল করে নিত সুবিধাবাদী গোষ্ঠীরা। *চিত্রা নদীর পারে* চলচ্চিত্রে পূজা সেরে বাড়ি ফেরার পথে বাসন্তি ধর্ষিত হয়, লোকলজ্জায় চিত্রায় ডুবে মরে। এখানে দেবী দুর্গার বিসর্জনের একই সময়ে বাসন্তিও যেন বিসর্জন দেয় নিজেকে, এখানে লং শট থেকে ক্লোজআপ শটে বাসন্তির মুখ আর দেবীর মুখ যেন সমার্থক হয়ে ওঠে।

চলচ্চিত্রগুলোতে চরিত্রদের খুব সাধারণভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তৎকালীন পরিবেশকে তুলে ধরতে এক্ষেত্রে চরিত্রের সাজসজ্জা, সংলাপ সবকিছুতেই বাহুল্যবর্জিতের ছাপ চোখে পড়ে। তাই বাদ্যযন্ত্র ছাড়া চরিত্রগুলো খালি গলায় গান করে। সালমাদের বাড়িতে মিনতির হারমোনিয়ামে গান, গ্রামোফোনে বাজানো রোমান্টিক গান, আনন্দে মিনতির বৃষ্টিতে ভেজা সবই যেন সাধারণ জীবনকে তুলে ধরে। আবার সরোজিনীর খালি গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত 'চাহি অতৃপ্ত নয়নে..' দর্শককে চরিত্রের অনুভূতি ও ভাবাবেগের সাথে যুক্ত করে।

দুরন্ত শৈশবও যখন কলুষিত

আলোচ্য দু'টি চলচ্চিত্রেই দুরন্ত, নির্লোভ ভাবনাহীন এক শৈশবকে তুলে ধরা হয়েছে। নানা বয়সের শিশুদের ধর্মীয় গণ্ডির বাইরে একসাথে খেলা চলে। কিন্তু সেখানেও একসময় ধর্মীয় বিশ্বাস করাল গ্রাস ফেলে। তাই *চিত্রা নদীর পারে*'তে খেলতে গিয়ে কবরস্থানের পাশে প্রস্রাব করতে গেলে হিন্দু হবার কারণে বিদ্যুৎকে ধরে অপমান-অপদস্ত করে এক প্রতিবেশী মুসলিম। ছোটবেলার এই অপমানের কারণেই নিজ জন্মভূমি ছেড়ে চিরতরে কলকাতা চলে যায় বিদ্যুৎ, আর পড়াশোনা হয় না তার। আবার *খাঁচায়* সূর্য্য, অরুণ, ভ্যাবলা, পুষ্প-এর গতিহীন, ছন্নছাড়া জীবন যেন ভাবনার কারণ হয় সরোজিনী-হিরণের। এরমধ্যেই খেলতে গিয়ে সহপাঠীদের হাতে *মালাউন* বলে অপদস্ত হয়, মার খায় ভ্যাবলা। তাই নিজের অক্ষমতায় সরোজিনী পুত্রের ব্যথায় নিশ্চুপ হয়ে থাকে।

সস্যুরের মতে, সাংস্কৃতিক সঙ্কেতলিপি দ্বারা স্থির করা দ্যোতক ও দ্যোতিত মধ্যকার সম্পর্ক স্থির নয়। শব্দ তার অর্থ পরিবর্তন করতে থাকে। ধারণাগুলো যা নির্দেশ করে, কালক্রমে তা পরিবর্তিত হয়। সংস্কৃতির ধারণাগত মানচিত্র, প্রতিটি ঐতিহাসিক বাঁকেই, পরিবর্তিত হয়ে যায়, ভুবনকে ভিন্নভাবে দেখতে থাকে (হল, ২০০৭: ৪৩)। অদৃশ্য খাঁচাতে বন্দীত্ব বোঝাতেই যেন তাই রূপকার্থে রাতে নির্ঘুম ভ্যাবলা খাঁচা বাঁধতে থাকে। এভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প যেন বড়দের থেকে ক্রমশ শিশুদের মধ্যেও প্রবাহিত হতে থাকে। যা এপারে বা ওপারে সবখানেই এই শিশুদের ভবিষ্যৎকে ধ্বংস করে দেয়। আবার বয়োজ্যেষ্ঠ্য এবং পিতা-মাতার প্রতি সন্তানদের রূঢ় আচরণে কষ্ট পায় সরোজিনী-হিরণ। এজন্যে সাপ মারতে গিয়ে মেঝো সন্তানের অকাল মৃত্যুতে শোকাতুর হয়। এখানে এক্সট্রিম লং শটে আলো-আঁধারের মধ্যে হুট করেই যেন অরুণ হারিয়ে যায়। ক্রন্দনরত সরোজিনীর কোলে মৃত অরুণ যেন পুরো পরিবারকে বিষণ্ন করে তোলে। লোকেশন ও আলোর অসাধারণ ব্যবহার এই দৃশ্যটিকে নান্দনিকভাবে তুলে ধরেছে।

চিত্রা নদীর পারে'তে মিনতিরা চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলে বান্ধবী সালমা দেখা করতে এসে শিশুকালের ছেলেমানুষি নিয়ে কথা বলে। বলে ছোটবেলায় তারা মিনতিদের উচ্চারণ নিয়ে পরিহাস করতো, কেননা তারা কাইচি-কে কেঁচি বলতো। আবার লাল পিঁপড়ে হিন্দু, কালো পিঁপড়েরা মুসলিম বলে ক্ষেপাত। *'চিত্রা নদীর পারে' সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়বাদ* লেখায় বিধান রিবেরু এই চলচ্চিত্রটিকে সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়বাদের এক চমৎকার প্রদর্শনী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেটি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দিয়ে দেখিয়ে দেয় এখনো মানুষ বড় হয়ে ওঠেনি (রিবেরু, ২০১৬)।

এভাবেই শৈশবের স্মৃতিমাখা চিত্রার পাড়ের মোহময়তা, প্রাকৃতিক নৈসর্গ আজীবন বাদল, মিনতিকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। এরা প্রত্যেকেই প্রতিনিয়ত চেষ্টা করেছে চিত্রার পাড়ের জীবন বেছে নিতে, কিন্তু নিয়তি সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাদল শহরে মিছিলে গুলি খেয়ে মারা যায়, পড়াশোনা শেষে চিত্রার বুকে ফেরার আশা তার অপূর্ণই থেকে যায়। অন্যদিকে নানা প্রতিকূলতা সামলে শিশুকালের স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে চলচ্চিত্রের শেষে সব ছেড়ে কলকাতায় পাড়ি জমাতে হয় মিনতিকে। পিতার কাছ থেকে জন্মভূমিতে আঁকড়ে থাকার যে অটল দীক্ষা সে নিয়েছিলো একসময় পরিণত বয়সে মিনতি তার চরম বাস্তবতা যেন বুঝতে পারে।

এজন্য শুরুর দিকে শিশুদের খেলাচ্ছলে 'ওপেনটি বায়োস্কোপ' ছড়াকে নির্মাতা প্রতীকীভাবে আবারও ব্যবহার করেন সমাপ্তিতে। যেটা আটকে যায় 'কলকাতা' শব্দ বারবার বলার মধ্য দিয়ে। যেখানে সব হারিয়ে মিনতির কলকাতায় চলে যাবার মধ্য দিয়ে জীবনের রূঢ় বাস্তবতা ও স্থবিরতাকে বোঝানো হয়েছে।

দেশভাগ যেন স্বপ্নভঙ্গের বেদনা, এক প্রহসন

১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন বাঙালি হিন্দু এবং মুসলিমদের জন্যে ছিলো বিরাট এক ধাক্কা। যা এই জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস, সন্দেহ আর নির্মম নানা ঘটনার জন্ম দিয়েছে। দেশভাগ মানব ইতিহাসের এক কালো অধ্যায় যেখানে বন্ধুই একসময় পরিণত হয়েছে শত্রুতে। তাই সংকট থেকে বাঁচতে হিন্দুরা চলে যাচ্ছিলো ওপারে। যা রয়ে যাওয়াদেরকে ফেলে দিচ্ছিলো আরও সংশয়ে। সংখ্যালঘু হবার এই ঝুঁকির কারণে শশীকান্ত বা হিরণকে প্রতিমুহূর্তে শঙ্কিত থাকতে হয়েছে। দেশভাগ ভুক্তভোগীদের ভাবনার জগতে প্রবল মানসিক সংঘাত নিয়ে এসেছে যা অব্যক্ত বেদনারূপে দগ্ধ করেছে, প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

বিনিময়ে হিরণের বাড়ি দেখতে আসে ধনী এক মুসলিম। আবার শামসুদ্দিনের সাথে শশীকান্তের কথায় জানা যায় কীভাবে একটি উঠতি সুবিধাবাদী শ্রেণী আইন-আদালতকে ব্যবহার করে অবৈধপথে সম্পত্তির মালিকানা হাতিয়ে ক্রমশ ধনী হয়ে উঠছিলো। আবার এরাই হক কথা বলার কারণে শামসুদ্দিনকে 'হিন্দু-ঘেঁষা' বলে কটাক্ষ করতো। এখানে আদালত পাড়ার দৃশ্যে লং শটের ব্যবহার এবং শশী-শামসুদ্দিনের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে এ পেশায় ধর্মীয়-সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক যে পরিবর্তন ঘটছিলো তা উঠে এসেছে।

রেপ্রিজেন্টেশন তত্ত্ব অনুযায়ী, ভাষা হলো দ্যোতকের সমাহার, কিন্তু অর্থ উৎপাদন করতে চাইলে দ্যোতককে অবশ্যই 'পার্থক্য পদ্ধতি'তে বিন্যস্ত হতে হবে। দ্যোতনায়ন-ঘটানো দ্যোতকগুলোর পারস্পরিক পার্থক্যকে বুঝতে হবে (হল, ২০০৭: ৪৩)। আলোচ্য চলচ্চিত্রগুলোতে নির্মাতারাও এই দেশভাগ এবং দেশত্যাগকে নানা প্রতীকের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। দেশত্যাগের আশা হিরণ ও সরোজিনীর মধ্যে একসময় গভীর দূরাশায় পরিণত হয়। হিরণকে সরোজিনী দেশভাগের প্রহসনের প্রতিভূ ভাবে। তার স্বপ্নভঙ্গ হয় এবং বিনাশীনি রূপ ধারণ করে।

দেশভাগ ধর্মের জাতপাতের প্রশ্নে চিরচেনা বিষয়কে আরো উস্কে দিয়েছে। *চিত্রা নদীর পারে* চলচ্চিত্রে দেখা যায়, শশীকান্তের বোন অনুপ্রভা 'অচ্ছুৎ' বিষয়গুলো মেনে চলেন। এমনকি নিজের

তৈরি নাড়ুও কাউকে খেতে দেন না। আবার নদীতে গোসল করতে গিয়ে এক বৃদ্ধের মতো, মিনতির মাসীও বলে ওঠেন, *দিলে তো ছুঁয়ে, কী জাত না জাত!* লং শটে চিত্রা পারের এ দৃশ্যে মিনতির হাসি যেন মাসীর বক্তব্যকে উপহাস করে। এ নিয়ে বোনকে কটাক্ষ করেন শশীও, ক্লোজ আপ শটে তার লজ্জিত মুখ দেখা যায়। আবার পাগল চরিত্রের মাধ্যমে নির্মাতা দেশভাগকে এক নির্মম প্রহসনরূপে তুলে ধরেছেন। এখানে পাগল যাকেই দেখে জিজ্ঞেস করে- *তুই যাচ্ছিস না আসতিছিস ? ঐ একই, যাওয়াও যা, আসাও তা।* শুরুতে ভগ্নপ্রায় দেয়াল এবং শেষ দৃশ্যে মিনতিদের শূন্য বাড়ির সদর দরজা দেশভাগের মর্মান্তিক ফলাফলকে তুলে ধরে। আবার নদী পারের সিঁড়িতে শশীর পড়ে যাবার দৃশ্যে মিডশট থেকে ক্যামেরা জুম ইন করে ক্লোজ আপে শশীকে দেখানোর মাধ্যমে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শশীর বন্দী জীবনের মুক্তিকে তুলে ধরেন।

খাঁচায় দেশভাগের বেদনা আর হাহাকার অর্থবহ হিসেবে পুরো চলচ্চিত্রে ফুটে উঠেছে। তাই যেন সরোজিনী কল্পনার রাজ্যে ঘুরপাক খায়। পাহাড় এলাকা, পাকা বাড়ির ভাবনায় অধীর হয়। মিডিয়াম ক্লোজ আপ শটে তার চোখে-মুখে যেন এই প্রত্যাশা ফুটে ওঠে। আবার রুল অব থার্ডস মেনে নলিনী কাকার যাবার দৃশ্যের চিত্রায়ন করা হয়েছে। যেখানে নির্মাতা হিরণ-নলিনী এবং নৌকায় নলিনীর পরিবার এবং চারপাশের পুরো পরিবেশকে এক্সট্রিম ওয়াইড শটে তুলে ধরেন।

খাঁচায় তক্ষকের ডাক বিশেষ গুরুত্ববহ। চলচ্চিত্রে মোট তিনবার এর ডাক যেন প্রতীকীভাবে কাহিনীর নতুন মোড় এবং অশনি সংকেতকে তুলে ধরেছে। প্রথমবার ডাকে যখন সাপ ধরতে গিয়ে অরুণ তক্ষককে মারতে নেয়, এর পরেই সাপের কামড়ে অরুণ মারা পড়ে। দ্বিতীয়বার হিরণ চেম্বারে বসে শুনতে পারে, দেখে বাড়ির ছাদ ধসে পড়ছে। এরপরেই সরোজিনীর ডাকে গিয়ে দেখে তার বাবার পক্ষাঘাত হয়েছে। শেষবারে ছাদে বসে সেতার বাজাতে থাকলে আশু বিপদের আশঙ্কাতেই যেন আবারো ডেকে ওঠে।

দেশভাগের কারণে জন্মভূমির প্রতি প্রবল আবেগ থাকা সত্ত্বেও কেবল ধর্মীয় পরিচয়ের জন্য শশীকান্ত কিংবা হিরণ দু'জনকেই প্রতিনিয়ত শুনতে হয়, ওপারে কবে যাচ্ছে? সময় গড়িয়ে চলে, প্রতিনিয়ত এই নিরাপত্তাহীনতা ও ভবিষ্যতের শঙ্কায় শুরুতে দেশ না ছাড়লেও অনেক হিন্দুই আস্তে আস্তে তল্পিতল্পা নিয়ে অজানার পথে পা বাড়ায়। শশীও কোর্টে তর্কে জড়ায় স্ব-ধর্মের বন্ধুদের সাথে, যাদের অভিমত- *আর থাকা যাবে না।* শামসুদ্দিনের সাথে কথোপকথনেও এই পরিস্থিতি চলে আসে। যেখানে শামসুদ্দিনের কণ্ঠে শোনা যায়, *শখ করে কেউ কি আর দেশ ত্যাগ করে?*

দেশভাগের পরে নানা ঘটনা পরম্পরা আর রাজনৈতিক পটপরিবর্তন দেশত্যাগের এই চাপ আরো বাড়িয়ে তোলে। জীবন যেন স্থবির হয়ে পড়ে। তাই চিত্রাপাড়ে শশীর দিক থেকে ক্যামেরা ধীরে ধীরে জুম আউট হতে থাকে। এরপরে ক্যামেরার মুভমেন্টে লং শট থেকে ক্রমে জুম ইন করে মিডশটে যায়। নদীপাড়ের সিঁড়িতে পড়ে যেতে দেখা যায় শশীকে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যেন শশীর সকল দুর্ভাবনা থেকে মুক্তিকে তুলে ধরে।

খাঁচাতে ওপারে যাওয়া নিয়ে সরোজিনী হিরণের চেষ্টাকে যথেষ্ট মনে করে না। দর্শকরাও বিনিময় প্রক্রিয়ার জটিলতা বুঝতে পারে। আবার ফ্ল্যাশব্যাকে সরোজিনীর অতীত স্মৃতি রোমন্থন এবং হিরণের সাথে কথোপকথনে ক্লোজ আপ শট ব্যবহার করে নির্মাতা সরোজিনীর মৌখিক অঙ্গভঙ্গির মধ্য দিয়ে সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনাকে তুলে ধরেছেন। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে যখন ওপার থেকে খবর আসতে থাকে একসময় তারা সকলেই বুঝতে পারে যে, সবই ভ্রম! এপার-ওপার সবখানেই আসলে এক। এজন্যই '৪৮ থেকে শুরু করে '৬৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১৭ বছর চেষ্টা করেও বিফল হয়ে *খাঁচায়* হিরণও যেন অপ্রকৃতস্থ আচরণ করে। তাই পুরো নিশ্চিত না হয়েও সরোজিনীকে বিনিময় ঠিক হয়েছে বলে জানায়। কিন্তু শেষে সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে আর যাওয়া হচ্ছে না জানালে এ প্রহসনে ক্ষোভে ফেটে পড়ে সরোজিনী।

চিত্র-৪: ওপারে যাওয়া নিয়ে সরোজিনীর স্বপ্ন দৃশ্য

বিদ্বেষ ও রাজনৈতিক দৈন্যতার প্রতিচ্ছবি

একসময় যেখানে ধর্মীয় বিশ্বাসের উর্ধ্বে উঠে মানুষের পারস্পরিক ভালোবাসা, বিশ্বাস ও বোঝাপড়াই ছিলো সব। সেখানে দেশভাগ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বদলে প্রবল অবিশ্বাস, অস্বস্তি নিয়ে আসে এবং দুই ধর্মের মানুষের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব বাড়ে। ফলে দেশভাগের পরবর্তীতে বিভিন্ন জায়গায় দাঙ্গা, সহিংসতা, হানাহানি ছড়িয়ে পড়ে।

তানভীর মোকাম্মেল (২০১৭) এর ভাষায়, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বয়ান হিসেবেই তিনি *চিত্রা নদীর পারে* নির্মাণ করেছেন। ১৯৬৪ সালের দাঙ্গা স্বচক্ষে দেখেছিলেন, যার কারণে তার বাড়ি খুলনার অনেক হিন্দুকেই চলে যেতে হয়েছিল। তার অনেক বন্ধুও সে সময় দেশত্যাগ করেছিল। যা তাকে আজো পীড়া দেয়। এজন্যই *চিত্রা নদীর পারে*'তে দেখা যায়, শুরুতে দেশত্যাগ না করার সিদ্ধান্তে অবিচল শশীকান্তের পরিবার একটা সময় শঙ্কায় পড়ে যায়। তাদের দেশ না ছাড়ার প্রত্যয়ে দোটানাতে ভোগে। চাচাতো বোন বাসন্তি ধর্ষিত হয়ে আত্মহত্যা করলে গ্রামে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা শুরু হয়। বাধ্য হয়ে শশীকান্তের ভাই নিধুও সস্ত্রীক কলকাতা চলে যায়। আবার ওপারে যাওয়া নিয়ে কথোপকথনে সরোজিনীর প্রত্যাশার পাশাপাশি মিডিয়াম ক্লোজআপ শটে হিরণের সংশয় ফুটে ওঠে।

দেশভাগ একইসাথে যেমন বিদ্যমান রাজনৈতিক নেতৃত্বের চরম সুবিধাবাদী মানসিকতার বহি:প্রকাশ করেছে তেমনি সুবিধাবঞ্চিত বা মাইনরিটির মানুষের জন্যে সুযোগ্য নেতৃত্বের সংকটকেও তুলে ধরেছে। তাই জেল থেকে ছাড়া পেয়ে কমরেড যতিন শশীকান্তের সাথে দেখা করতে এসে বলেন, *বর্ডারের এপার কও আর ওপার কও মাইনরিটির অবস্থা পৃথিবীর কোথাও ভালো না।* আবার যতিন পূর্ব পাকিস্তান থেকে মানুষের দেশ ছাড়া প্রসঙ্গে বলেন, *রাজনৈতিক টানাপোড়েনে এই মাইগ্রেট প্রবণতা আরো বাড়তে থাকে।* এভাবে বহু সচ্ছল পরিবারই পূর্ব বাংলা থেকে ওপারে অনিশ্চিতের পথে পা বাড়ায়। এদের অনেকেই সর্বস্ব হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে যায়।

চলচ্চিত্রে একটা সময়ে উকিল শশীকান্ত আদালত পাড়াতেই বেশিরভাগ সময় কাটাত। দেশভাগ সেখানেও বিপুল পরিবর্তন নিয়ে আসে। দেখা যায়, একসময় যে আদালত পাড়াতে হিন্দুদের আধিপত্য ছিল সেখানে সময়ের পরিবর্তনে মুসলমানেরা আধিপত্য করতে থাকে। শশীকান্তেরও উকিল ব্যবসার প্রসার ক্রমশ কমে যেতে থাকে। আবার '৪৭-এর দেশভাগের পরে যখন পাকিস্তানি শাসকরা সামরিক আইন চালাতে থাকে তখন গোটা বিচার ব্যবস্থাই সামরিক শাসনের অনুকূলে চলে যায়। তাই কমরেড যতিনরা গণমানুষের কথা বললেও বাস্তবে কোনঠাসা হয়ে থাকেন। তাদের অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশের প্রচেষ্টা কেবল সাংস্কৃতিক চেতনা তৈরিতেই সীমিত হয়ে পড়ে। সার্বিক সমাজ পরিবর্তনে তাদের এই প্রচেষ্টা তেমনভাবে আলোর মুখ দেখে না।

*চিত্রা নদীর পারে'*তে নৃপেন মাস্টার বা যতিন এরা কেউই এই রাজনৈতিক দৈন্যতায় আশার আলো দেখতে পাননি। কেবল ধর্মের ভিত্তিতে এই দেশভাগ কীভাবে একজনের জন্মগত আত্মপরিচয়কে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে তা শশীকান্ত মানতে পারেননি। এজন্যই নৃপেনের সাথে কথোপকথনে শশীকান্ত বলে ওঠেন- *কোন সাদামুখো র‍্যাডক্লিফ সাহেব পেন্সিলে দাগ কেটে দিলো, আর এদেশ আমার পর হয়ে গেলো।* আবার দেশত্যাগের চাপ নিয়ে শামসুদ্দিনের সাথে আলাপ ক্যামেরার টু শটে আরো বিস্তারিতভাবে উঠে আসে। জমি দখলের মামলার দৌরাত্ম্যের পাশাপাশি সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ব্যক্তিক সকল বিষয় নিয়ে তাদের এই আলোচনা দর্শককে দেশভাগের বিভিন্ন প্রেক্ষিত অনুধাবনে সাহায্য করে।

প্রাবন্ধিক আহমদ রফিক বলেছেন, দেশভাগের একটি বড় অমানবিক দিক ছিন্নমূল উদ্বাস্তু জনশ্রেণীর ধনমান ও মর্যাদার আর্থ-সামাজিক ট্র্যাজেডি (রফিক, ২০১৪: ৪৩৬)। তিনি তাঁর *দেশবিভাগ: ফিরে দেখা* বইয়ে আরো বলেছেন, দেশভাগ বাংলা ভূখণ্ড ও বাঙালি জাতিসত্তাকে এবং তার দুই প্রধান ধর্ম সম্প্রদায়ের চেতনাকেই বিভক্ত করেনি, ভূখণ্ড ভিত্তিতে ও চৈতন্যের জগতে সমধর্মী সম্প্রদায় বিশেষকেও দ্বিখণ্ডিত করেছে। এ বিভাজন স্বাভাবিক নয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান-ভিত্তিকও নয় (রফিক, ২০১৪: ৪৪১)।

পরিশেষ:

আশৈশব হেঁটে যাওয়া চেনা পথ, সাত পুরুষের বসতি, স্বজনের কবর আর শ্মশান, আজন্মলালিত নানা স্বপ্ন, বহু স্মৃতি, নদী, মাঠ, ঘাট সব কীভাবে কলমের এক খোঁচাতেই অচেনা আর পর হয়ে যায় তার এক নিদারুণ বাস্তবতা যেন '৪৭ এর দেশভাগ। দেশভাগ হিন্দু-মুসলিম জাতির মধ্যকার দ্বন্দ্বের রাজনৈতিক সমাধান হিসেবে এলেও বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী এবং আজো বিদ্যমান। দীর্ঘদিন ধরে এখানে বসবাস করলেও ধর্মের কারণে দেশভাগে এপার এবং ওপারে বিপুল সংখ্যক মানুষকে স্থানান্তরিত হতে হয়েছিলো। এর প্রভাবে তাদের মানুষ পরিচয়ের বদলে ধর্মীয় পরিচয়ই হয়ে উঠেছিল মূখ্য, যার কারণে বাস্তুহারা হয়ে সর্বস্বান্ত মানুষকে পরিণত হতে হয়েছিল উদ্বাস্তুতে। এই অঞ্চলের মানুষের অসাম্প্রদায়িক চিন্তাভাবনায় যা বিপুল পরিবর্তন নিয়ে এসেছিলো, তাদের জীবনযাপনে ও মনোজগতে নিয়ে এসেছিল ব্যাপক পরিবর্তন। দাঙ্গা, নির্যাতনের কারণে সবকিছু ছেড়ে

চলে যেতে হয়েছিল অনেক মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত এবং ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষদের। এভাবে ভিটেমাটি সবকিছু ফেলে কোনমতে এই আগমন-প্রস্থান তাদের জীবনে নিদারুণ শঙ্কা, অনিরাপদ ভবিষ্যৎ ও অসহায়ত্ব বয়ে এনেছিল।

দেশভাগকে বিষয় হিসেবে নিয়ে নির্মিত নমুনায়িত দু'টি চলচ্চিত্রেই দেশভাগ পরবর্তী সময়কে কয়েক খণ্ডে ভাগ করে চরিত্রগুলোর সম্পর্ক ও গভীরতা এবং সময়ের পরিবর্তনকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে তুলে ধরা হয়েছে। মানবীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বেদনাকে উপস্থাপনের মাধ্যমে কাহিনীকে এক সূত্রে বাঁধতে চেয়েছেন নির্মাতাদ্বয়। কেবল অর্থপূর্ণ সংলাপ নয়, শব্দ ও সংগীত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে কাহিনীকে এগিয়ে নিতে এবং প্রাসঙ্গিকতা তৈরিতে।

চলচ্চিত্র নিয়ে এই গবেষণার ফলাফলেও দেখা যায়, অসাম্প্রদায়িক বাঙালির জীবনে ও যাপনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল দেশভাগ। বাঙালি হয়েও নিজের মাতৃভূমি, ভাষা ও সংস্কৃতি থেকে পৃথক হবার এ বেদনা হাহাকার হয়ে তাদের হৃদয়ের গহীনে বেজেছে বারবার। মানুষ হিসেবে তাদের আত্মপরিচয়কে করেছে প্রশ্নবিদ্ধ। দেশত্যাগের এই অসহনীয় যাতনা ও উদ্বেগ তাদের ভাবনার জগতে প্রবল মানসিক সংঘাত নিয়ে এসেছে যা বড়পর্দায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। জন্মভূমি ছেড়ে আসার সে অনুভূতি ভুক্তভোগীরা বয়ে বেড়িয়েছেন আজীবন এবং এই মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতার বয়ান যেন প্রতি মুহূর্তে অব্যক্ত বেদনারূপে দগ্ধ করেছে তাদের। দেশভাগ এভাবেই ধর্মীয় পরিচয়কে সামনে এনে বাঙালির সত্তাকে চরম সংকটে ফেলে দিয়েছিল।

চলচ্চিত্র পরিচিতি:

চিত্রা নদীর পারে:

চিত্রা নদীর পারে (১৯৯৯)। কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা: তানভীর মোকাম্মেল। চিত্রগ্রাহক: আনোয়ার হোসেন। সংগীত: সৈয়দ শাবাব আলী আরজু। শব্দ গ্রহণ: মফিজুল হক। সম্পাদনা: মহাদেব শী। শিল্প নির্দেশনা: উত্তম গুহ। অভিনয় শিল্পী: মমতাজউদ্দীন আহমেদ, আফসানা মিমি, রওশন জামিল, সুমিতা দেবী, তৌকির আহমেদ প্রমুখ। প্রযোজনা ও পরিবেশনা : কিনো আই ফিল্মস। নির্মাণকাল: ১৯৯৯। সময়: ১১০ মিনিট। রঙ: রঙিন।

খাঁচা:

খাঁচা (২০১৭)। কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ: আকরাম খান, আজাদ আবুল কালাম। পরিচালনা: আকরাম খান। চিত্রগ্রাহক: তানভীর খন্দকার। সংগীত: বিনোদ রায়। শব্দ গ্রহণ: আজম বাবু। সম্পাদনা: সামির আহমেদ। শিল্প নির্দেশনা: মাসুদ রহমান। অভিনয় শিল্পী: জয়া আহসান, আজাদ আবুল কালাম, মামুনুর রশীদ প্রমুখ। প্রযোজনা ও পরিবেশনা: ইমপ্রেস টেলিফিল্ম। নির্মাণকাল: ২০১৭। সময়: ১৭০ মিনিট। রঙ: রঙিন।

তথ্যসূত্র:

আমিনুজ্জামান, সালাহউদ্দিন এম. (২০১১)। *এসেনশিয়ালস অব সোশ্যাল রিসার্চ*। অসডার পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

আহমেদ, কামাল (২০২১, এপ্রিল ১২)। দেশ বিভাগের অভিজ্ঞতা ও জাতীয় ইতিহাস রচনার সমস্যা, *প্রতিচিন্তা*, https://www.protichinta.com/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A7%9F-

%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%B0%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE, ২০ মার্চ, ২০২১ তারিখে সংগৃহীত।

দত্ত, মিলন (২০১৯, মে ৯)। হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক, সাম্প্রদায়িকতা ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সহমন ডট কম*, https://sahomon.com/welcome/singlepost/hindu-muslim-relation-communalism-rabindranath-tagore-, ২২ মার্চ, ২০২১ তারিখে সংগৃহীত।

দাস, বীণা (১৯৯৮)। হিংসা, দেশান্তর ও ব্যক্তিগত কণ্ঠস্বর, পৃষ্ঠা: ১৮১-১৯০, গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, *নিম্নবর্গের ইতিহাস*। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

পান্ডে, জ্ঞানেন্দ্র (১৯৯৮)। ভগ্নাংশের সমর্থনে: দাঙ্গা নিয়ে কী লেখা যায়?, পৃষ্ঠা: ২৫৮-২৮৬, গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, *নিম্নবর্গের ইতিহাস*। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

মোকাম্মেল, তানভীর (পরিচালক) (২০১৭)। *সীমান্তরেখা* [প্রামাণ্যধর্মী চলচ্চিত্র], কিনো আই ফিল্মস।

মুন্না, দেবদুলাল (২০১৯, নভেম্বর ১৯), বাংলা সাহিত্যে দেশভাগ, *বার্তা টোয়েন্টিফোর ডটকম*, https://barta24.com/details/arts-literature/63871/collage-montage-episod-sixteen#, ২২ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখে সংগৃহীত।

বাদল, কামরুল হাসান (২০২১, মে ০১)। দেশভাগের ক্ষত এবং সাম্প্রদায়িকতার কুৎসিত রূপ, *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*।

https://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/66233, ২৫ মার্চ, ২০২১ তারিখে সংগৃহীত।

রফিক, আহমদ (২০১৪)। *দেশবিভাগ: ফিরে দেখা*। অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা।

রিবেরু, বিধান (২০১৬, নভেম্বর ২৩)। ‘চিত্রা নদীর পারে’ সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়বাদ, *বাংলা ট্রিবিউন ডটকম*।
https://www.banglatribune.com/159515/%E2%80%98%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E2%80%99-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%9F%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6, ২২ মার্চ, ২০২১ তারিখে সংগৃহীত।

সিজন, রাজীদ (২০২১)। *তানভীর মোকাম্মেল: এক অতঁর চলচ্চিত্রকার*। বেহুলা বাংলা, ঢাকা।

সিং, খুশবন্ত (১৯৯৬)। *ট্রেন টু পাকিস্তান*, আবু জাফর অনুদিত। দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

হল, স্টুয়ার্ট (২০০৭)। *রেপ্রিজেন্টেশন: কালচারাল রেপ্রিজেন্টেশনস অ্যান্ড সিগনিফাইং প্র্যাকটিসেস*। সেজ, লন্ডন।

হল, স্টুয়ার্ট (২০১৫)। *রেপ্রিজেন্টেশন*, ফাহমিদুল হক অনুদিত। সংহতি প্রকাশন, ঢাকা।

In Conversation with Tanvir Mokammel: Rendering the great sense of loss of 1947 through film (2017, August 26). *The Daily Star*. https://www.thedailystar.net/star-weekend/rendering-the-great-sense-loss-1947-through-film-14525

[**Abstract:** Historically, the Partition of 1947 brought about huge changes in the lives of the people of India. This political division on the basis of religion alone has brought terrible suffering to the lives of many people of the Hindu and Muslim communities in large parts of the two states. There are many brutal and ugly incidents of communalism associated with the partition of the country. Countless people had to suffer torture, loss of life and cruel treatment just because of different religious identity. The film captures the agony of permanently leaving the country or the inner-spiritual struggle of the individual in order to highlight history, similar to other artistic forms. In order to investigate how the partition of India is portrayed in Bangladeshi films, the following three questions have been raised: how is partition portrayed in the movies made about partition in Bangladesh; what is the nature of this portrayal in terms of story, perspective, and style; and what impact did it have on Bengali life in the context of that time? The findings of this study, which used two movies as a sample in its content analysis method, the critical circumstances of 1947 brought religious identity to the fore and exposed the Bengali entity to fierce conflict. The seeds of communalism were profoundly ingrained in non-communal Bengalis' lives and minds through the triggering of numerous crises.]